

અનુપૂર્ણ વાંશલાય અનુભવ : દેવગોષ્ઠી કથકાર

ચિત્રોત્તર  
ડિજિટલ અનુભવ



અનુભવ



eBongComics.blogspot.com  
chitrochor.blogspot.com



এবং কষিঅ ৩ চিএচোর কষিঅের  
যৌথ পট্রিশেনা।

মূল কাহিনী

অ্যালান মুর

আঁকা / বর্ণসংস্থাপন

ডেভ গিবন্স

রঙ

জন হিগিন্স

সম্পাদনা

লেন উইন

[chitrochor.blogspot.com](http://chitrochor.blogspot.com)

বাংলা সংস্করণের ভাষান্তর, লিপিবিন্যাস

এবং সম্পাদনা

দেবানীষ কর্মকার

অক্ষর সংশোধন

ইন্দ্রনীল কাঞ্জিলাল

প্রচ্ছদ রূপান্তর

রূপক ঘোষ

[chitrochor.blogspot.com](http://chitrochor.blogspot.com)

[chitrochor.blogspot.com](http://chitrochor.blogspot.com)

সর্বকালের সেরা কমিক্সের (মতান্তরে গ্রাফিক নভেল) তালিকা বানাতে গেলে সে-তালিকায় অবশ্যই উপরের দিকে নাম থাকবে ‘ওয়াচমেন’-এর। ১৯৮৬’র সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হওয়ামাত্রই বলা যায় ‘ওয়াচমেন’ কমিক্সের দুনিয়ায় এক বড়সড় বিপ্লবের সূত্রপাত করে। সুপারহিরো কমিক্সের ক্লিশে ধ্যানধারণাগুলোই আমূল বদলে ফেলেন লেখক অ্যালান মুর। চরিত্রগুলোকে একেবারে সাদা, একেবারে কালোর ছকে না ফেলে মুর সাদাকালো মিশিয়ে তাদের ধূসর বানালেন— তারা কেউই পুরোপুরি সৎ বা অসৎ নয় (একেবারেই রক্তমাংসের মানুষের মতো— তাদের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, লোভ, অহংকার সবই মজুদ), একজনের চোখে কেউ হয়তো ভাল, আবার সে-ই আরেকজনের চোখে খারাপ। গল্পটাকে মুর সমান্তরাল ক্রমে বললেন না— অনেকটা ন্যায়ার (Noir), ননলিনেয়ার (Non-Linear) সিনেমাগুলোর মতোই তাঁর গল্প এগিয়ে চলে, সাথে ডেভ গিবন্সের বাস্তবসম্মত আঁকা ও জন হিগিন্সের রঙের মুগিয়ানায় বইয়ের পাতা থেকে চরিত্রগুলো যেন জলজ্যন্ত হয়ে ওঠে। ‘ওয়াচমেন’-এ পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ নেই— একদম শেষে কমিক্সের প্যানেল বাদে আরও বাড়তি কিছু পাতা যোগ করা (যা কমিক্স না হলেও গোটা কমিক্সটাকে বুঝতে হলে সে-পাতাগুলোকে এড়িয়ে গেলে চলবে না), কোনও বিখ্যাত গানের লাইন বা কারও উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনাক্রম বোঝানো, কোনও একজনের মুখ থেকে গল্প না-বলানো, শুধুমাত্র কথা-বেলুনের উপস্থিতি (গোটা কমিক্সটিতে একটিও চিন্তা-বেলুন নেই; সিনেমার মতো চরিত্রগুলোর মুখভঙ্গিতেই তাদের মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে), গোটা কমিক্সটি জুড়ে এক কাল্পনিক দুনিয়া (সে-দুনিয়ার শহরের দেওয়ালগুলোতে গ্রাফিতির ছড়াছড়ি, তাতে হাজারোটা ইঙ্গিতের ইশারা), কাল্পনিক সময়কে দেখানো হয়েছে— অনেকটা, “কী হতো, যদি এমনটা হতো?” ধরনের।

এবার আসা যাক ওয়াচমেনের বাংলা অনুবাদের প্রসঙ্গে, এত কিছুর ডালি নিয়ে সাজা কোনও কিছুতে হাত দিলে কী অবস্থা হয় সেটা ওয়াচমেন পড়ার সময় বুঝতে পারিনি! কোনও ভাল বিদেশি কমিক্স (বা গ্রাফিক নভেল!) পড়লে সেটা পড়ার অনুভূতি অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে বরাবরই ইচ্ছে করে, সে-ইচ্ছে থেকেই মনে হয়—এটা বাংলায় করলে কেমন হয়? এবং সে-ইচ্ছে থেকেই আরেকটি ইচ্ছে জাগে— যত কমিক্স (বা গ্রাফিক নভেল!) আছে সব একাই অনুবাদ করব, আর কাউকে অনুবাদ করতে দেব না (উদ্ভট অবাস্তব খেয়াল!); যাইহোক, কথাপ্রসঙ্গে এ-বছরের শুরুর দিকে “চিত্রচোর” রূপক ঘোষের সাথে ওয়াচমেন নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখনই ও আমায় প্রচ্ছদ করে দেওয়ার প্রস্তাবটা দেয়। অনুবাদে হাত দিয়ে ইন্দ্রনীল কাজীলাল দা’কে এক-দু’পাতা দেখানোয় উনি নিজেই ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার (প্রফ-রিডার আরকি!— প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, কমিক্সের শেষের বব ডিলানের গানটির অনুবাদ উনিই করেছেন) প্রস্তাবটা দেন— দু’জনের এই দুই প্রস্তাবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাজি হওয়া ছাড়া তো আর কোনও উপায় ছিল না! কিন্তু অনুবাদ যতই এগোতে থাকে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব-দ্বিধা বাড়তে থাকে, একটা বাংলা কমিক্সে কথা বলা-চিন্তা করা-বর্ণনা দেওয়া থেকে শুরু করে ওনোম্যাটোপিয়া (Onomatopoeia) ছাড়াও সবকিছুতেই বাংলা ভাষা চোখে পড়লে মনটা এক অনাবিল আনন্দে ভরে যায়! অনুবাদে হাত দিয়ে প্রথমে গ্রাফিতি, পোস্টার, সবকিছুর বাংলা করার ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রেখেছিলাম, তারপর আস্তে আস্তে যত সময় এগোতে থাকে, ততই... তবে যেগুলো বাস্তবসম্মত-মানানসই সেগুলোকে অবশ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, আপনারা পড়তে পড়তেই সেটা বুঝতে পারবেন। ঠিক যে-কারণে ওয়াচমেন নামটা বা এ-কমিক্সের চরিত্রগুলোর নামও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, অনুবাদটিতে যদি ডঃ ম্যানহাটানের কথাগুলো আপনাদের কারোর আক্ষরিক বলে মনে হয়, তবে জানবেন সেটা ইচ্ছাকৃত, কেননা উনি অমন ভাবেই কথা বলেন।

অনেক কিছুই লিখে ফেললাম। সত্যি বলতে কী, গুছিয়ে লেখা একদমই আসে না, তাই এটিকে সম্পাদকীয়-ভূমিকার পাতা না ধরে অনুবাদকের পাতা বলে ধরে নেওয়াটাই ভাল। যাকগে, অনেক হল কথাবার্তা, এবার আসুন সবাই মিলে কমিক্সটা (বা গ্রাফিক নভেল) পড়ি বরং...

রোশাকের রোজনামা, ১২ই অক্টোবর, ১৯৮৫

আজ সকালে গলিতে একটা কুকুরের মশা দেখেছি, দেখেই অনুপ্রাণনের ভাণ্ড ঠেলে উঠেছিলাম। এই শহর আমাকে ভয় পায়। শহরের আমল চেহারাটা আমার দেখা হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রাঙ্কলো নর্দমায়ে ভরে গেছে আর নর্দমাঙ্কলো রয়েছে। নর্দমাঙ্কলোর গা যখন ঘা-প্যাঁচড়ায় ভর্তি হয়ে যাবে তখন সবক'টা নরকের কীট এর নীচের জমা রয়েছে ভুবে মরবে।

আরাজীবনের ব্যভিচার আর খুনের নোংরামি যখন গলা পর্যন্ত ভুবে যাবে, যখন সবক'টা বেশ্যা আর নেতা-মুন্সীরা উদারের দিকে তাকিয়ে “আমাদের বাঁচান্ড” বলে চিৎকার করবে...

নিয়তি  
শিয়বে

...আমি তখন নীচের  
দিকে তাকিয়ে ফিম্ফিমিয়ে  
উঠব- “না।”

ওদের সবক'টার হাতে সুযোগ ছিল।  
ওরা আমার বাবা কিংবা প্রেমিডেন্টে ট্রায়ালের  
মতো ভাল মানুষের আদর্শ অনুসরণ করতে  
পারত।

প্রকৃত ভদ্রলোক, যাঁরা  
মৎস্যে উদারজ্ঞ করায়  
বিশ্রাম করতেন।

তার বদলে এরা সব লম্পট আর সাম্যবাদীদের  
দা চেটেছে। ব্রহ্মহত্যাই পারেনি এসব করতে  
করতে এরা এমন জায়গায় চলে গেছে  
যেখান থেকে কখনওই ফেরা যাবে না।

তাই আমার কাছে “এরা  
শুধরানোর সুযোগ পায়নি”,  
এই নালিশ জানাতে  
এমো না।

গোটা দুনিয়াটা এখন খাদের কিনারায়  
দাঁড়িয়ে আছে, নীচের ভয়ঙ্কর নরকের দিকে  
উঁক দিচ্ছে। সবক'টা উদারপন্থী, বুদ্ধিজীবী  
আর মিষ্টিভাষীদের...

...হঠাৎ করেই আর  
কিছুই বাক্য থাকবে  
না।

হুম...

অনেকটা উঁচু  
থেকেই পড়েছে।



হ্যাঁ, বেচার! একটা জিনিস আমাকে সবসময় ভাবায় জানো... উঁচু থেকে ফুটপাথে পড়ার আগেই কি জ্ঞান চলে যায়, নাকি ছেঁরে পড়ার পরে হয়?

সত্যি বলতে কী, সেটা জানার আমার কোনও আগ্রহ নেই।

এখানে কী হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

chittrachor.blogspot.com



দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে।

হয় দু'জন লোক নয়তো একজন ড্রাগের নেশায় এই কাজ করেছে, কেননা দরজাটা ঘরের ভেতর থেকে শিকল দিয়ে আটকানো ছিল।



“...তার মানে ঘরের মালিক এই ঘটনার সময় ঘরেই ছিল।”



হুম। লাশটা আমি দেখেছি, বেশ হাটাকোটা ছিল লোকটা। এই বয়সে এমন জোয়ান শরীর খুব একটা বেশি দেখা যায় না।

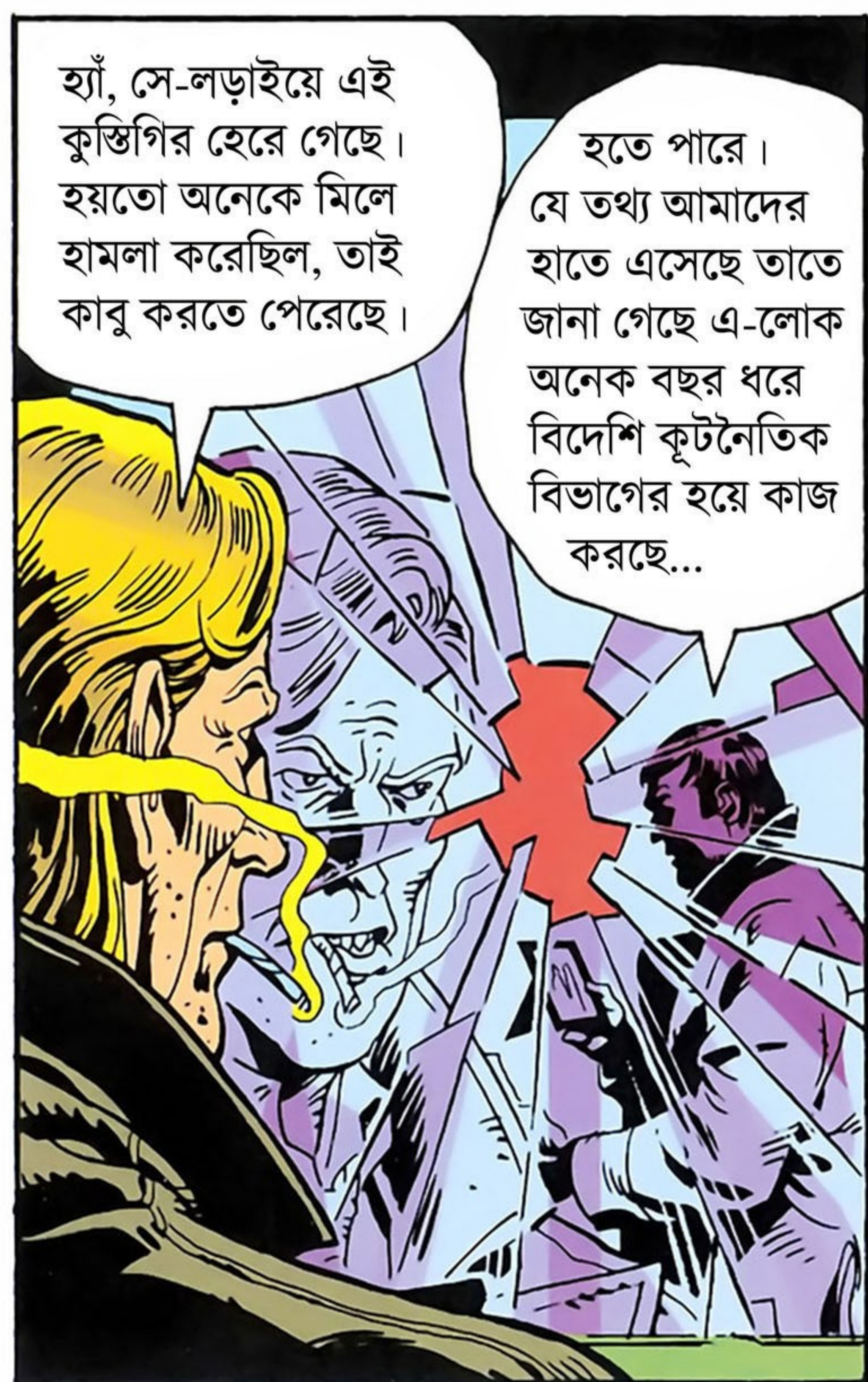
মানে, বেঁচে থাকার সময়ের কথা বলছ তো?

chittrachor.blogspot.com



“হ্যাঁ... এই লোকটার, এই ব্লেক লোকটার, ঘরের মালিকের... কুস্তিগিরের মতো চেহারা ছিল।

“মারা যাওয়ার আগে বেশ জোরদার লড়াই-ই হয়েছে।”



হ্যাঁ, সে-লড়াইয়ে এই কুস্তিগির হেরে গেছে। হয়তো অনেকে মিলে হামলা করেছিল, তাই কাবু করতে পেরেছে।

হতে পারে। যে তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তাতে জানা গেছে এ-লোক অনেক বছর ধরে বিদেশি কূটনৈতিক বিভাগের হয়ে কাজ করছে...



“এ-লোক একেবারে জমিদারদের মতো জীবনযাপন করত। ওর পেশিগুলোতে চর্বি জমে গেছিল মনে হয়।”



ছবিতে দেখে তো চর্বি জমে গেছিল মনে হচ্ছে না। কাটা দাগটা কীভাবে হল কে জানে? দেখে...

এই! ছবিতে যে লোকটার সাথে এ হাত মেলাচ্ছে... সে-লোকটা ভাইস প্রেসিডেন্ট ফোর্ড!

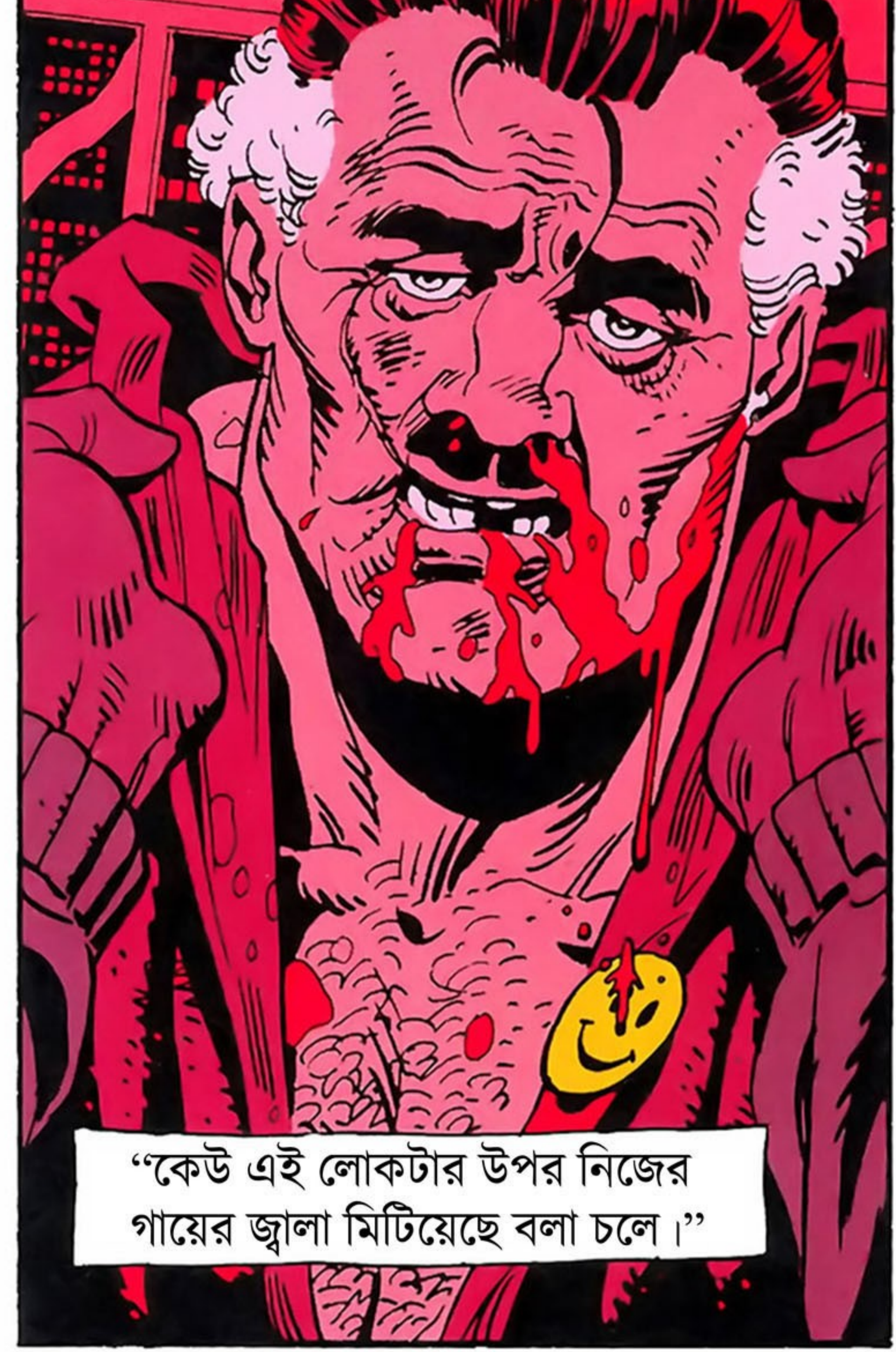
chittrachor.blogspot.com

“আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার! শোনো, কথাটা যেন আমাদের মধ্যেই থাকে, আমার মনে হয় একে আমরা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি।

“এমন ধরনের কাজ এ লোকের সাথে ঠিক খাপ খায় না।”

এ-কैसे নতুন কিছু সূত্র খুঁজে পেলে সত্যিই বেশ আশ্চর্য হব।

মানে, এটাকে কী বলবে তুমি? অল্প কিছু টাকা খোয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে এ ছিঁচকে চুরির কেস নয়...



“কেউ এই লোকটার উপর নিজের গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে বলা চলে।”



মানে, লোকটা জানলা দিয়ে নীচে পড়ল কীভাবে বলতে পারো?

পা পিছলে পড়ে গেছে হয়তো।

উঁহ, ব্যাপারটা অতটাও সোজা নয়, বুঝলে হে! জানলার কাচটা প্রচণ্ড মোটা। তুমি কেন, ওই দশাসই লোকটারও ওটার উপরে পা পিছলে পড়ে কাচ ভাঙার কথা নয়।



“তুলে আছাড় না মারলে কাউকে দিয়েই ও-কাচ ভাঙা সম্ভব নয়।”



বেশ, তুমি বলছ এই এডওয়ার্ড ব্লেক লোকটা বেশ হাটাকোটা ছিল। সুতরাং এ-লোককে একা একটা লোকের পক্ষে তোলা সম্ভব নয়। তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে দু'জন লোক মিলে এ-কাজ করেছে।

ক'তলায় যাবেন?

ওহো, ইয়ে... একতলায়।



লিফট চলল নীচে...



তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না... এটা কি মামুলি চুরি নাকি এর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে?

শোনো, এ স্রেফ মামুলি চুরি হলেও হতে পারে... হয়তো একদল উটকো গুন্ডা মদ-গাঁজা-চরস বা হেরোইন-কোকেনের নেশায় এসব করেছে...

chitrochor.blogspot.com



“শহরে আজকাল এরকম ধরনের পাগলামি যে প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে সে-খবর রাখো নিশ্চয়ই!”

“এসব করার জন্য ওদের কোনও উদ্দেশ্য লাগে না।”



তো, মোদা কথাটা হল এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কোনও মুখোশধারীদের কৌতূহল বাড়িয়েও আর লাভ নেই, সবকিছুতে নাক গলাতে আসবে তাহলে আবার।

এটা নিয়ে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে ঠিকই, কিন্তু সবার সামনে...



“...কী বলে এই ঘটনাটাকে চোখের আড়াল করব?”



মাথায় আসছে না। আমার মনে হয় তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশিই মাথা ঘামাচ্ছ। সাতাত্তর সালে কিন আইন জারি হওয়ার পর শুধুমাত্র সরকারের পোষা পাগলগুলোরই পাগলামি করার অনুমতি আছে।

ওরা এখন আর সবকিছুতে নাক গলায় না।

ওদের সবক'টা জাহান্নামে যাক! আচ্ছা, রোশাকের ব্যাপারে তোমার কী মত?



এটা নিয়ে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে ঠিকই, কিন্তু সবার সামনে...



“রোশাক অবসরে যাওয়ার লোক নয়, এমনকী ওর আর ওর বন্ধুদের সরকারি ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ও একটুও বদলায়নি।

“রোশাক হয়তো আশেপাশেই কোথাও আছে।”

chitrochor.blogspot.com



রোশাককে বোধহয় দুনিয়ার সেরা স্ক্যাপাটে বললেও কম বলা হবে। আবার খুনের দায়ে ফেরারি আসামীও বলা যায়।

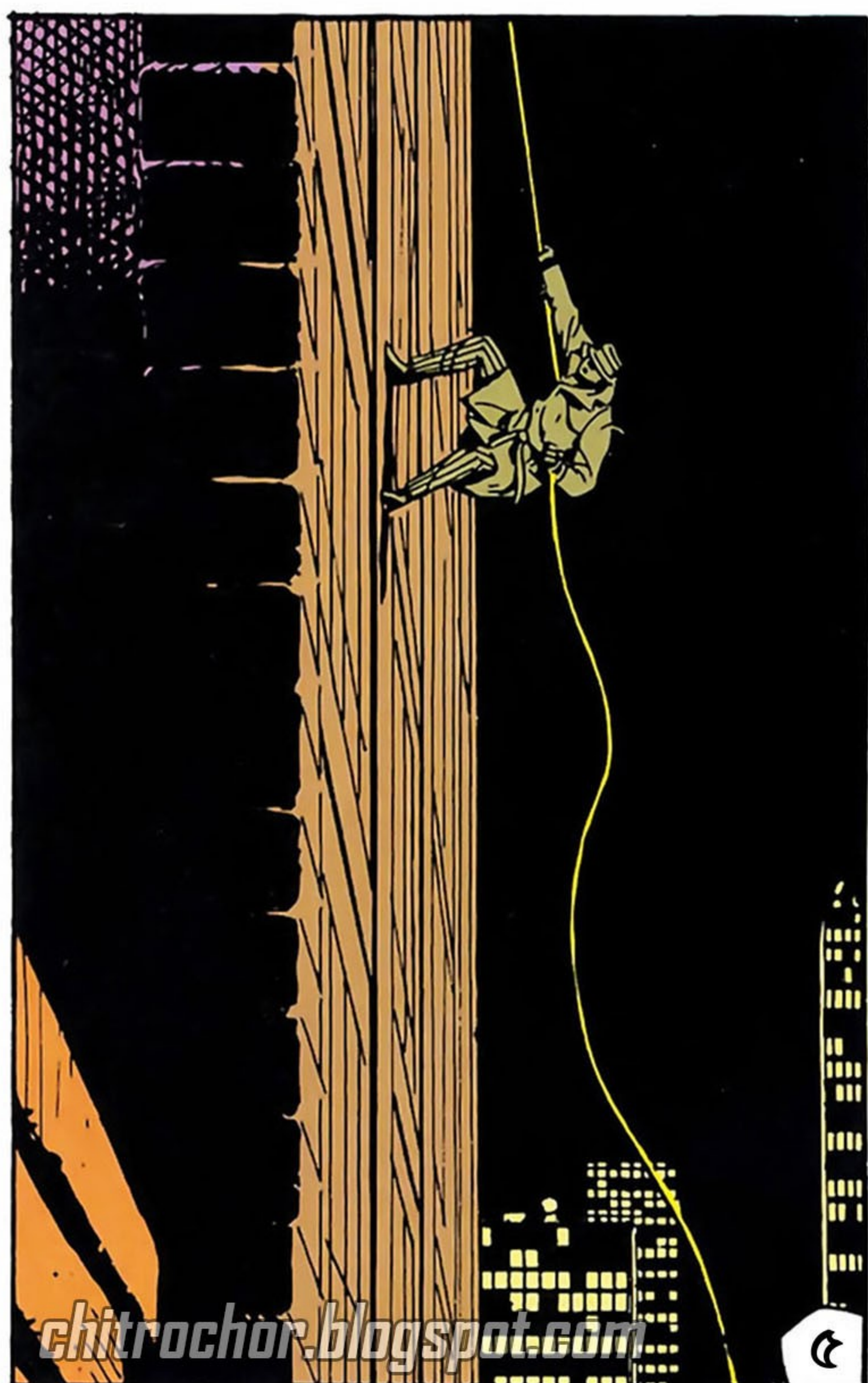
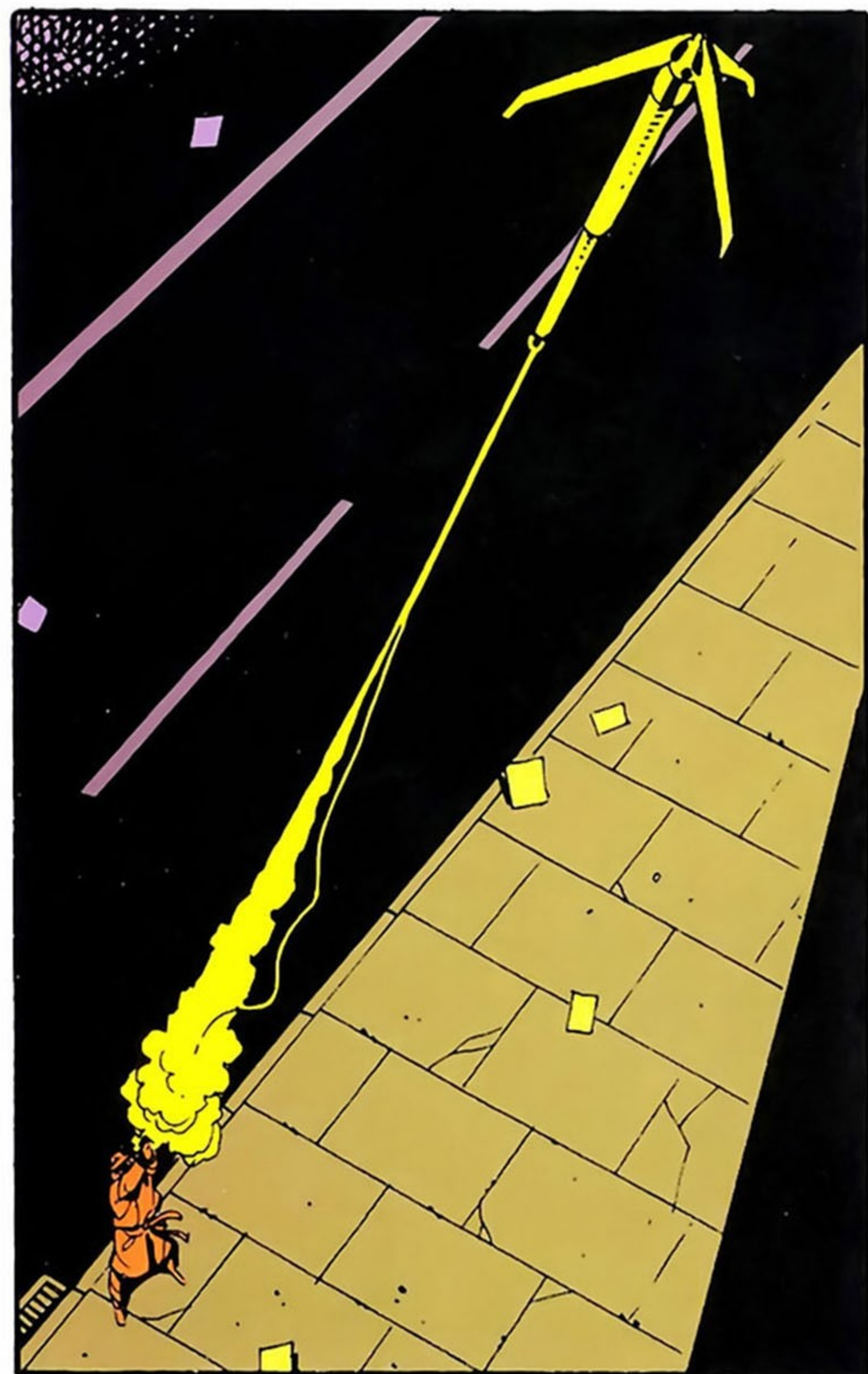
এক স্ক্যাপাটে খুনি। এ-কैसे ও যদি নিজেকে জড়ায়, শহরটা তাহলে লাশের চিবিতে ভর্তি হবে...

কী হল?



ইয়ে, কিছু না... গা'টা কেমন যেন কাঁপুনি দিয়ে উঠল।

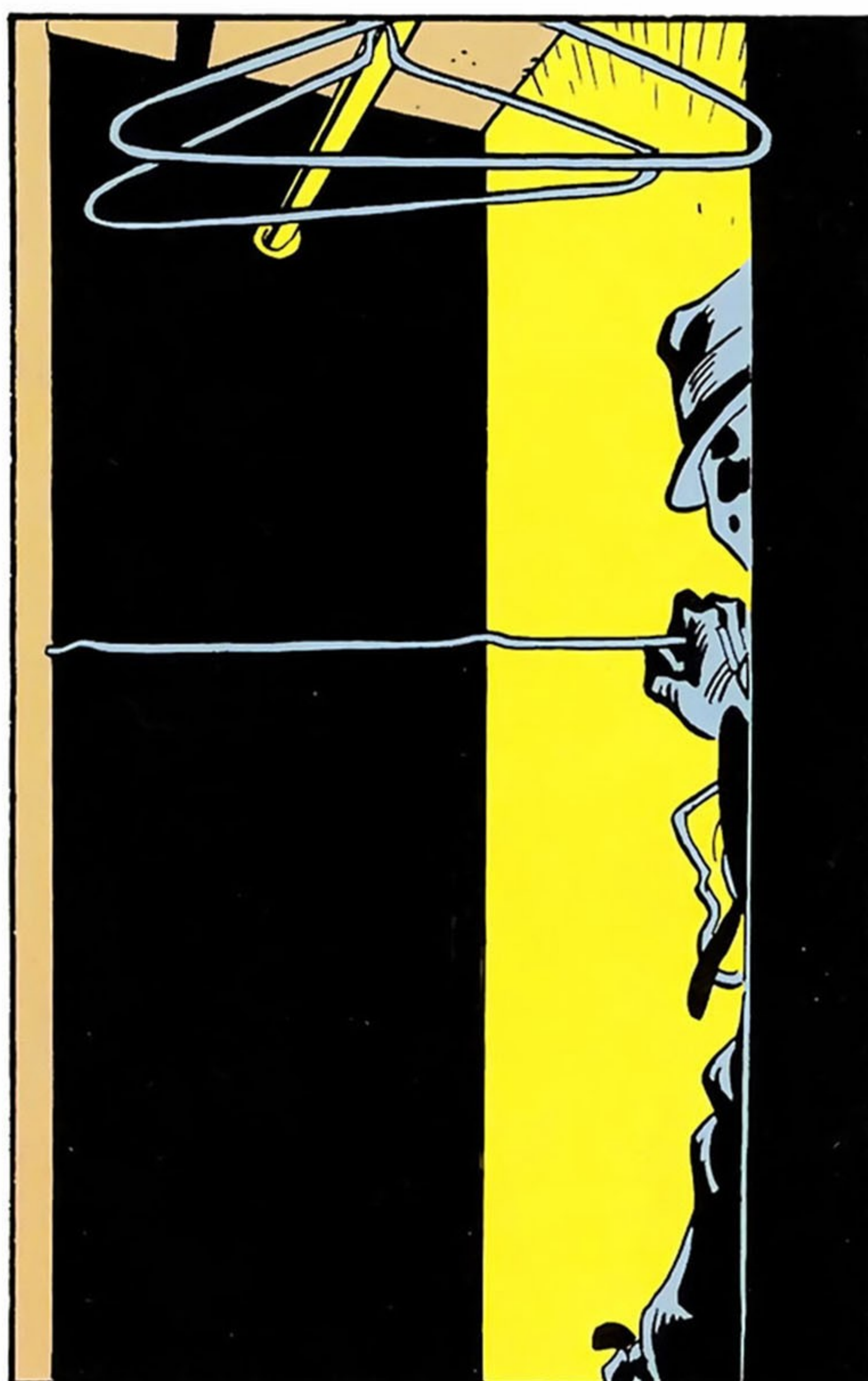
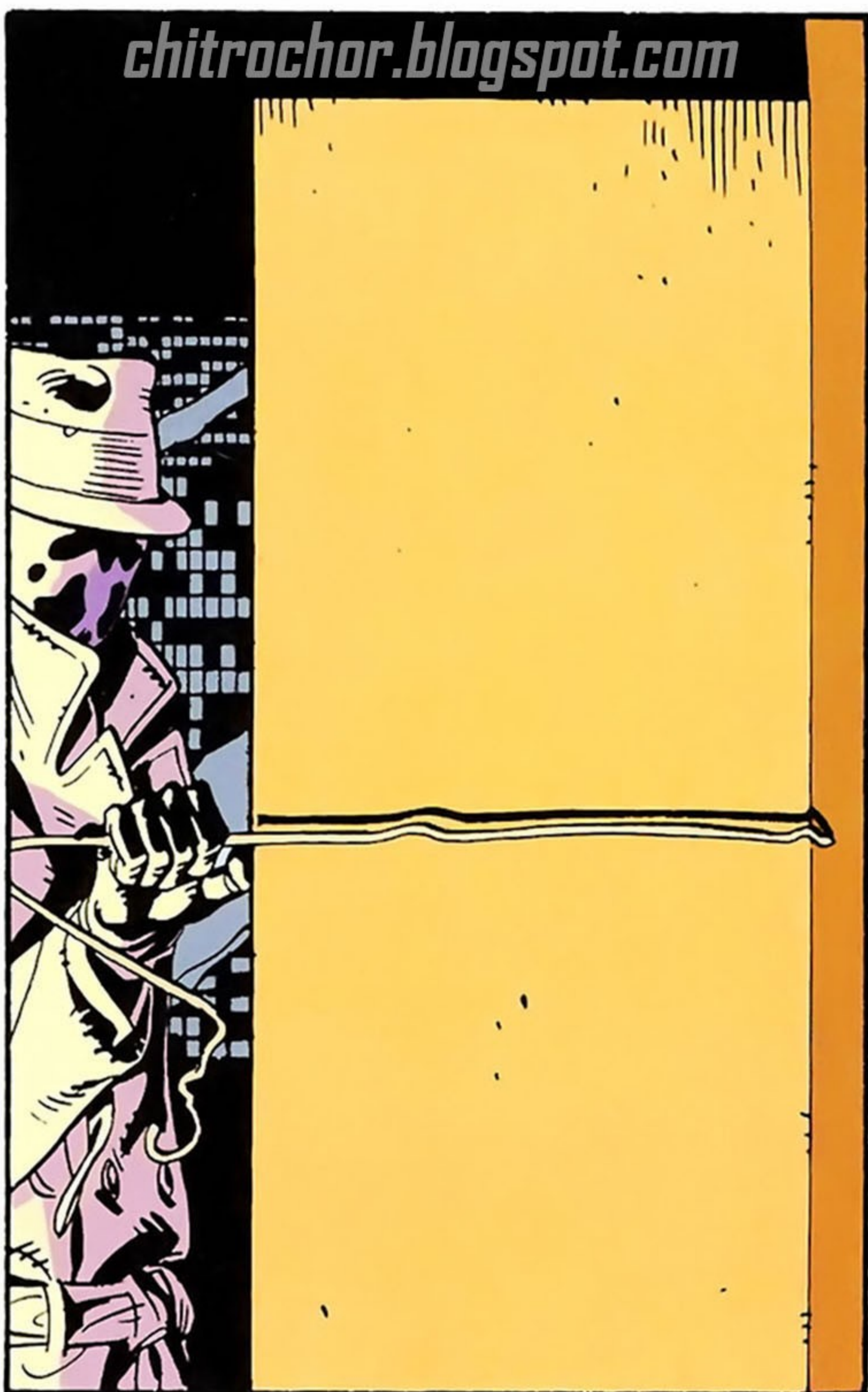
ঠাণ্ডাটা একটু বেশিই পড়েছে মনে হয়।

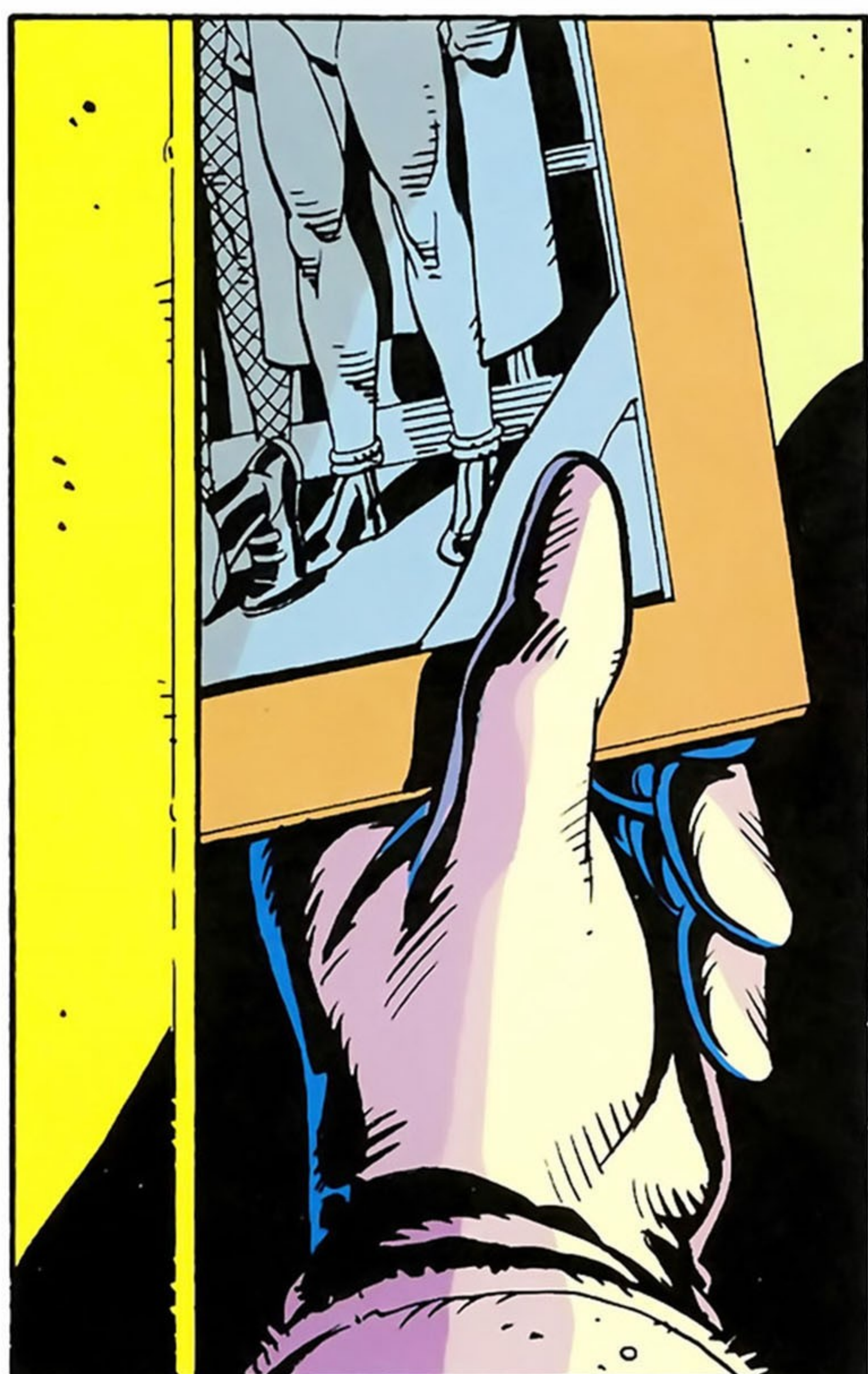
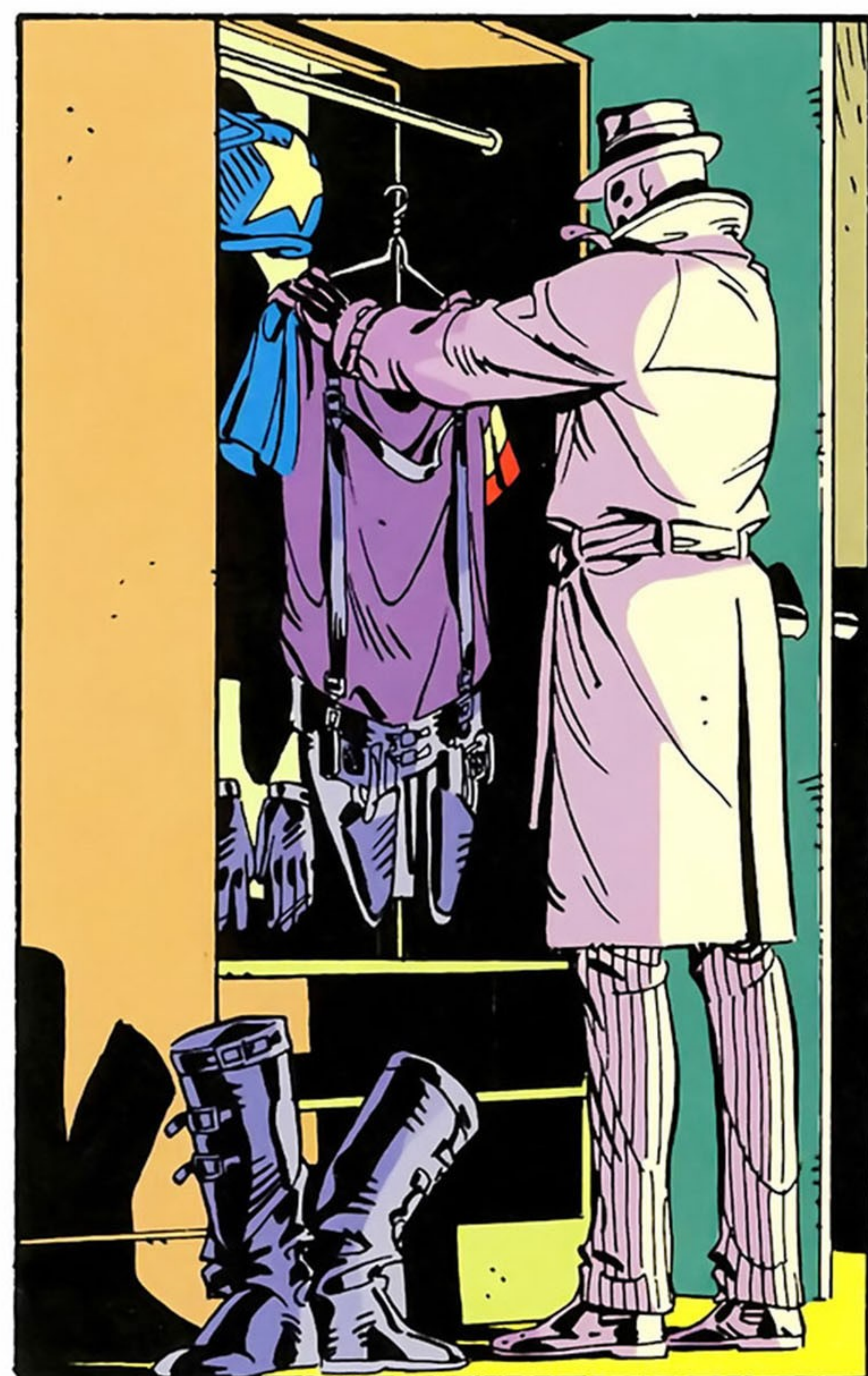
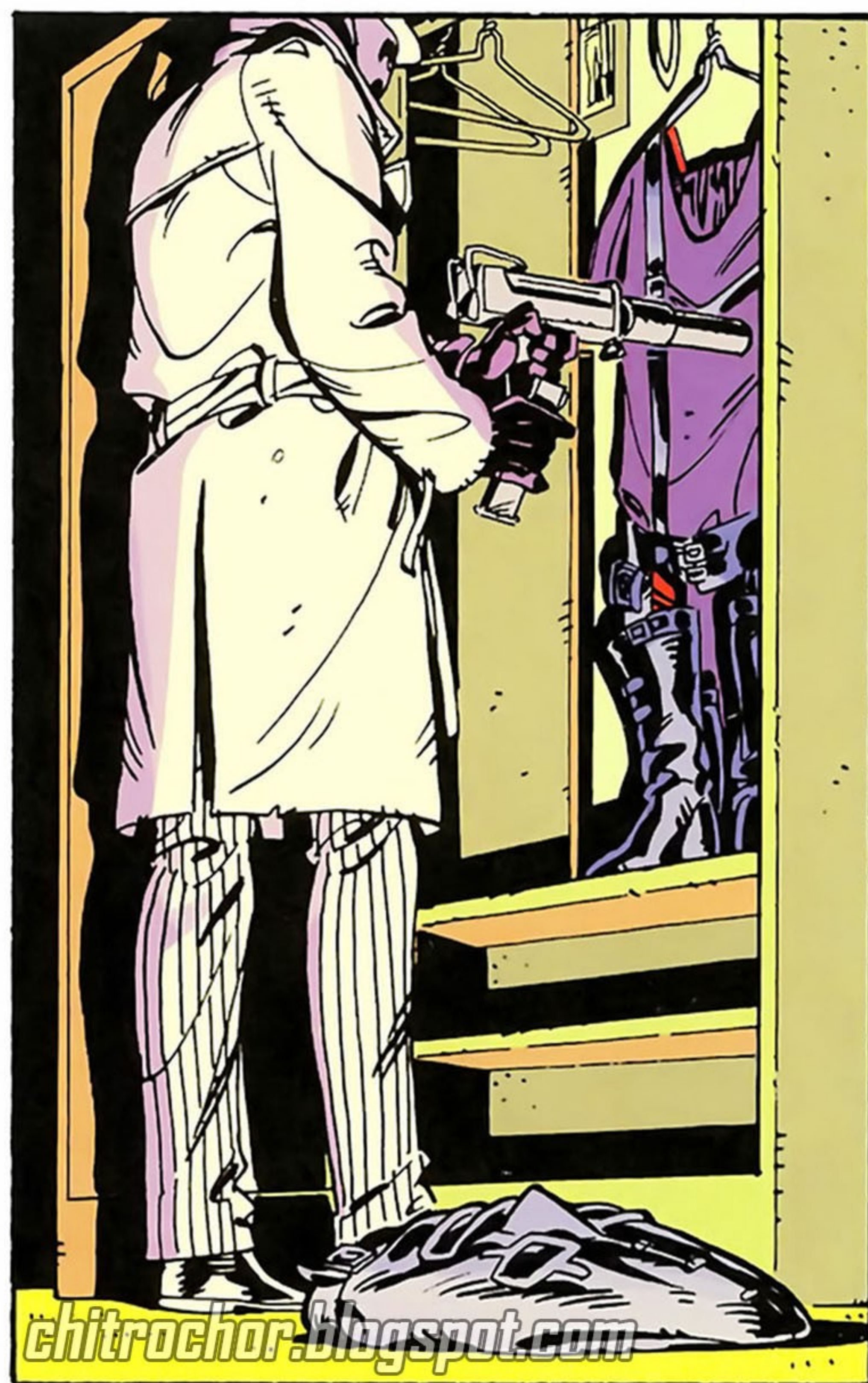
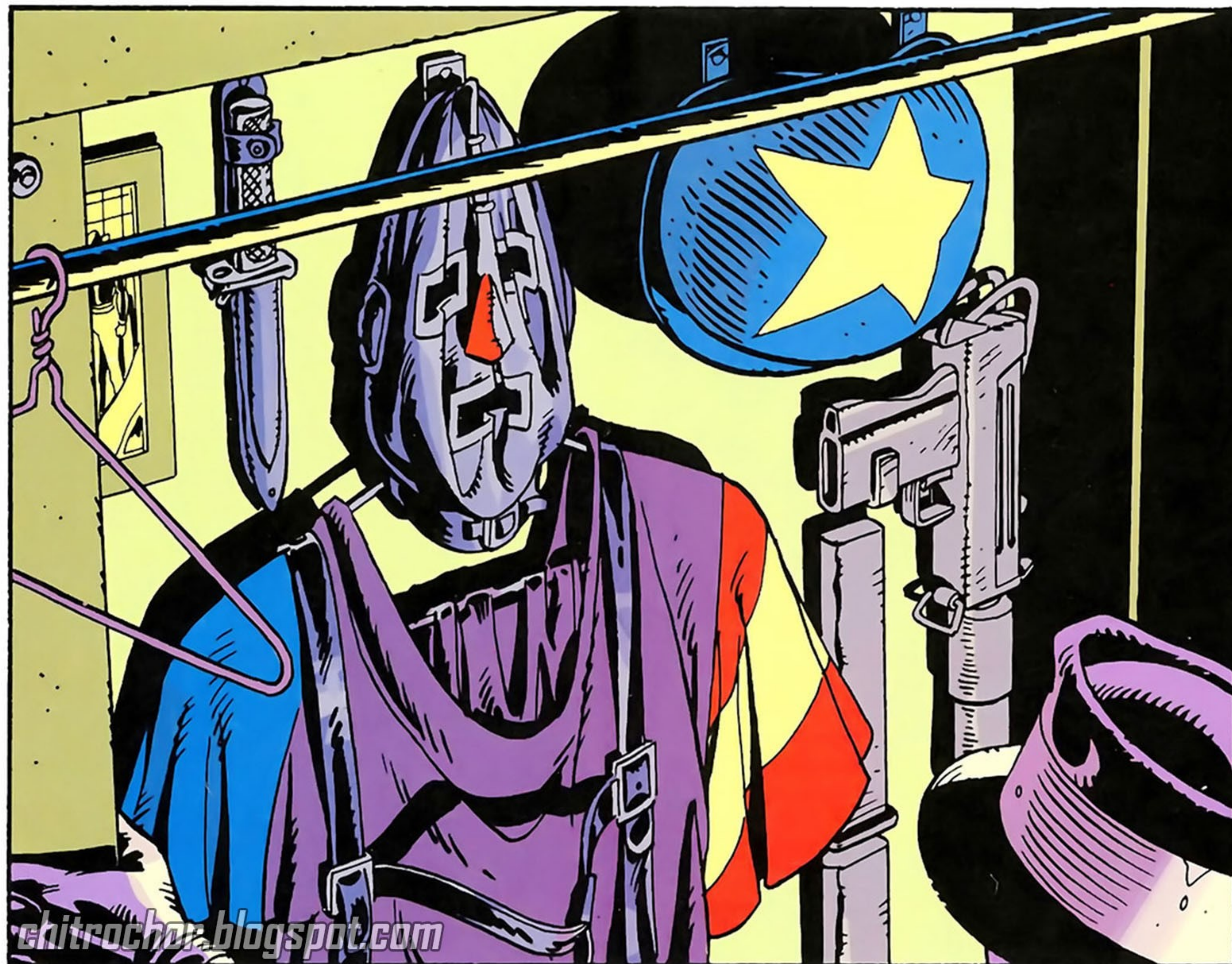


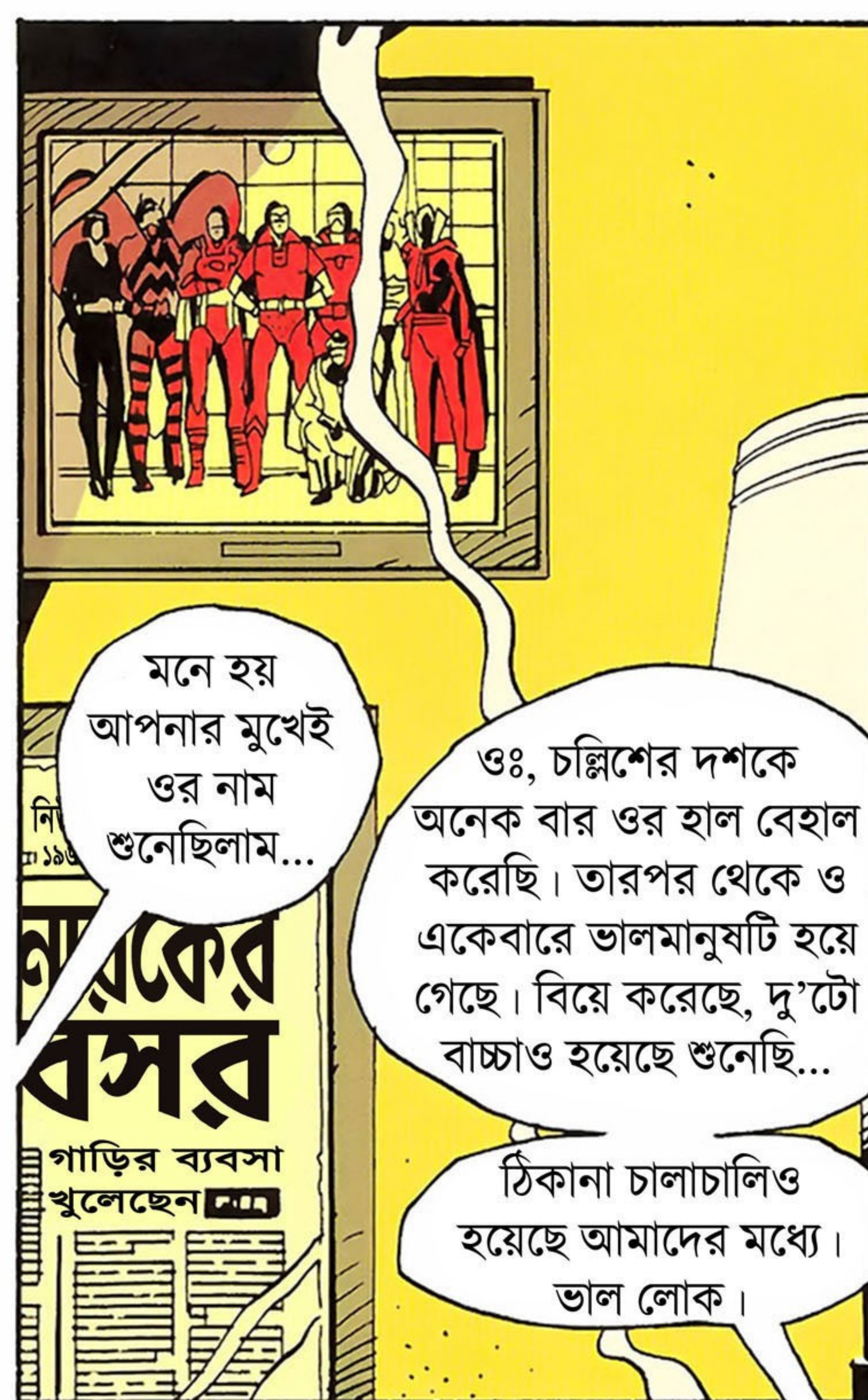


মধ্যরাতে, অতন্দ্র প্রহরী...

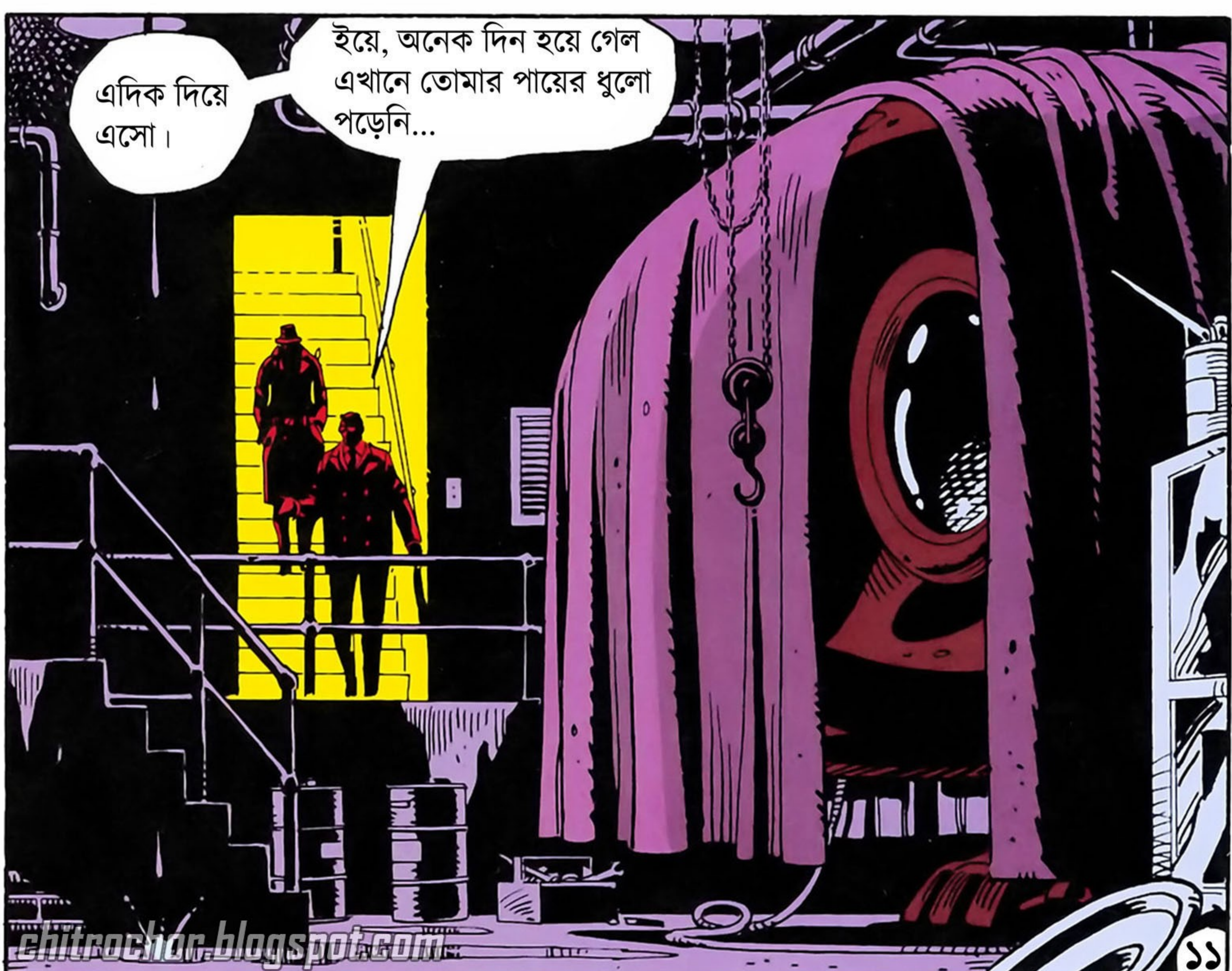


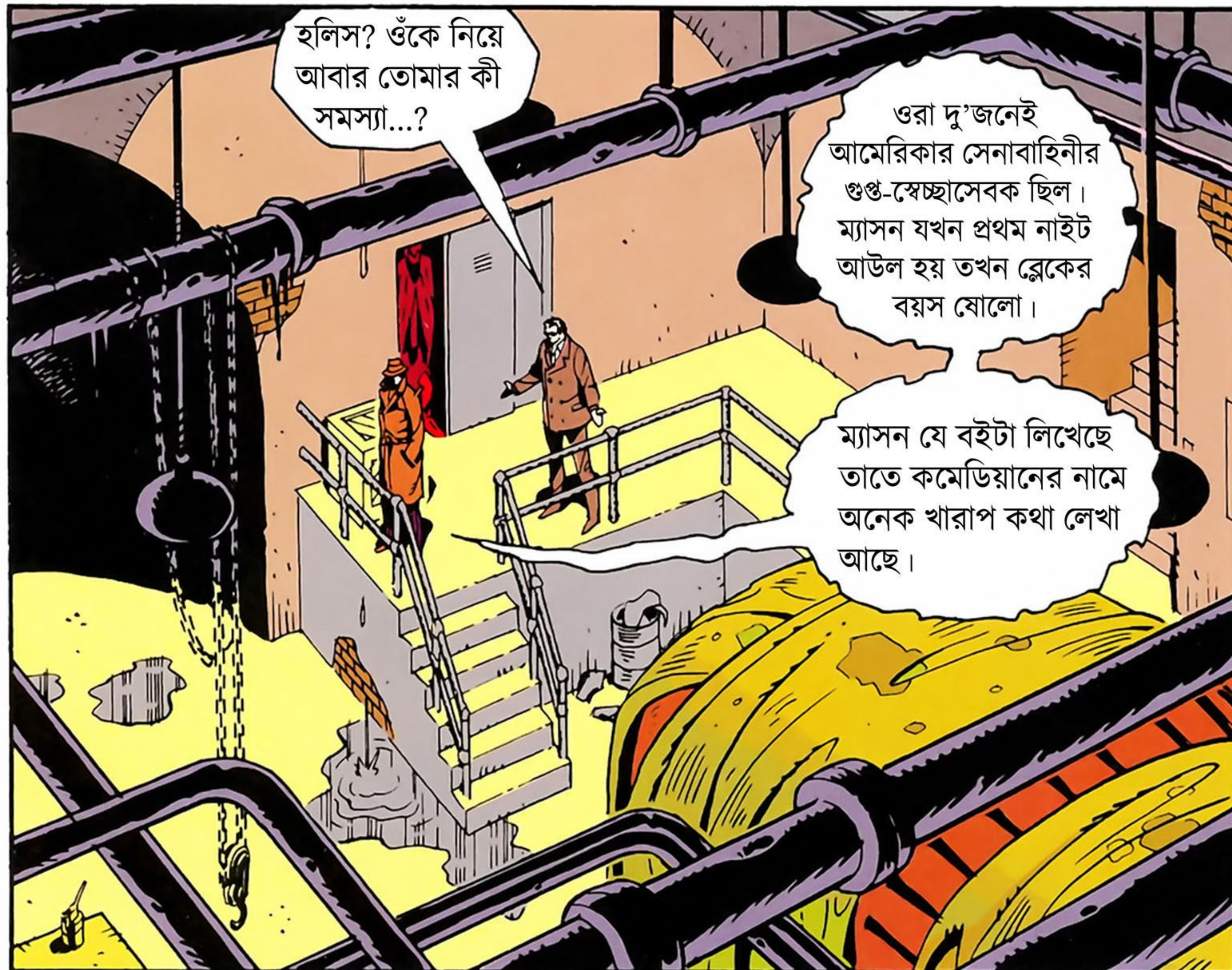




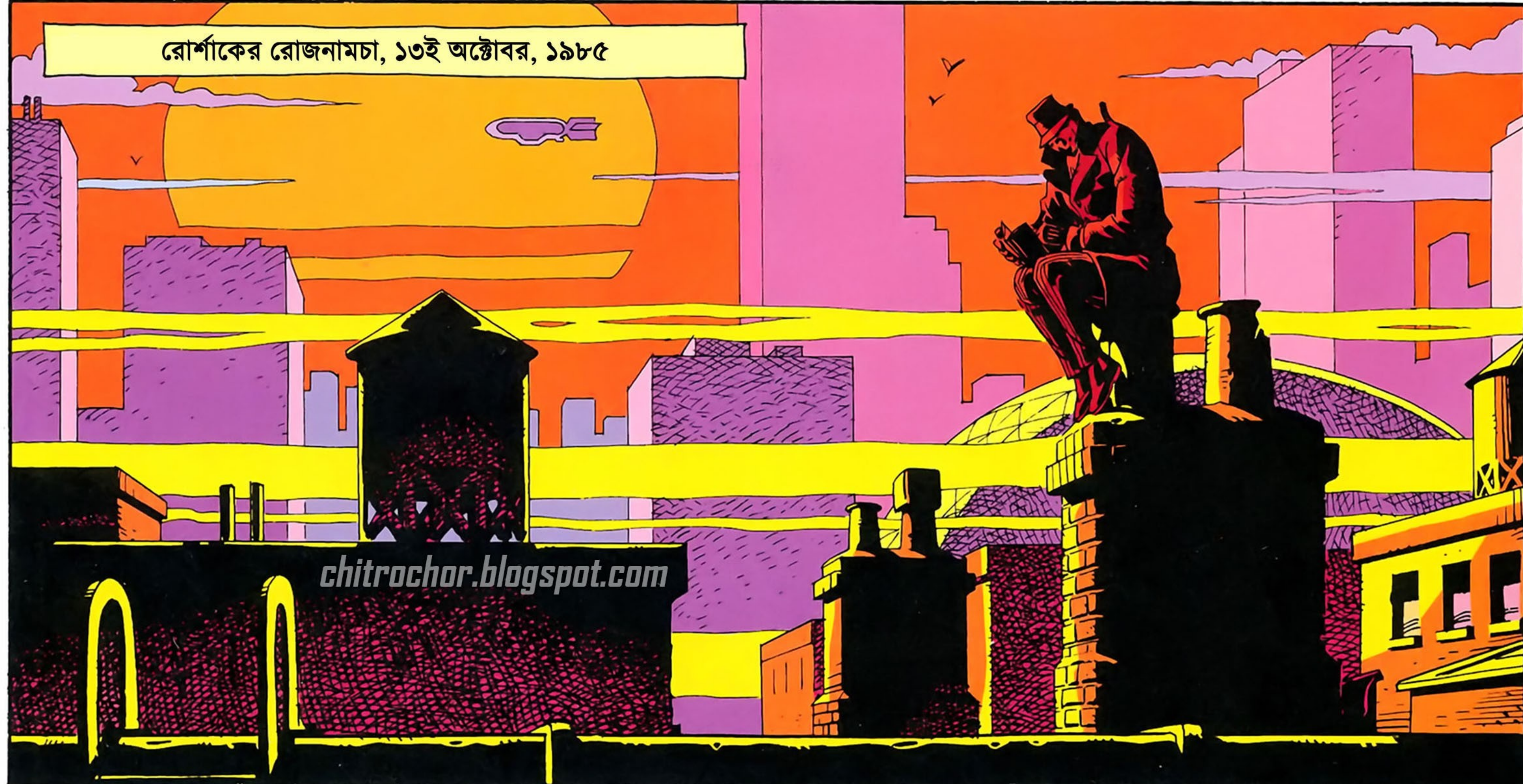














chitrochor.blogspot.com



রা...

রোর...  
রোর...

রোরশাক! ক্-ক্-কেমন  
আছে, বন্ধু?



ভালই আছি,  
হ্যাপি হ্যারি।

তোমার খবর কী?



ভাল! আমি  
ভা... ভালই  
আছি!

ত-ত-তুমি ভাল আছো শুনে  
আমারও খুব ভাল লাগছে!

আর ইয়ে...  
আর ইয়ে...



ওঃ, ভগবান!

দয়া করে খুনোখুনি  
শুরু কোরো না!



শুক্রবার রাতে রাস্তার  
ফুটপাথে একজনের লাশ  
পাওয়া গেছে। ঘটনাটা  
ঘটার সময় সে-লোক একা  
ছিল বলে আমার মনে হয়  
না।

যে মারা গেছে  
তার নাম  
এডওয়ার্ড ব্লেক।

আমার বন্ধু ছিল।



এই, শুনলি? ওর নাকি বন্ধু  
ছিল! গায়ে নতুন ডিওডরান্ট  
মাখা শুরু করেছে মনে হয়!

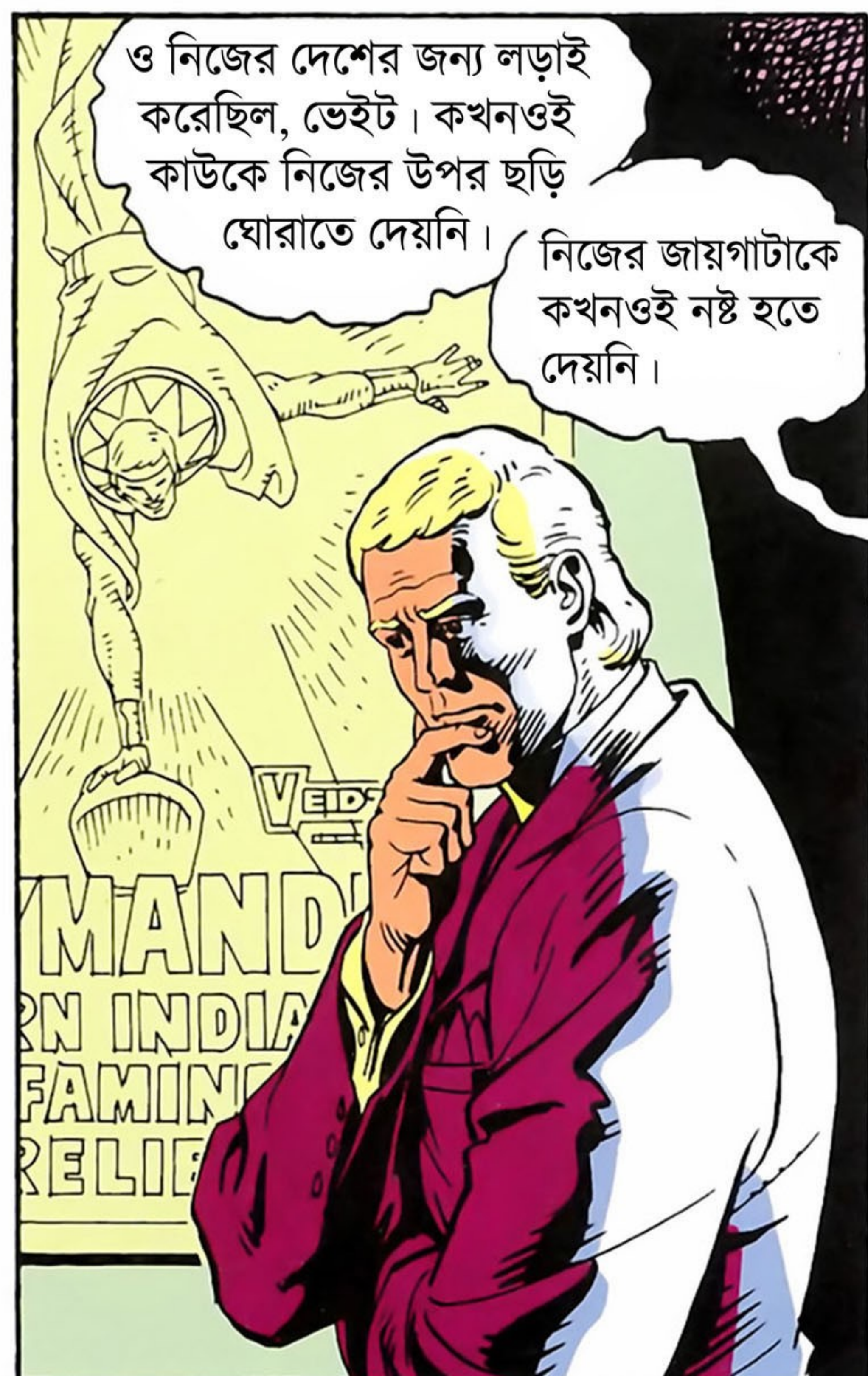
সিড, ভাই,  
তোর কাছে হাত  
জোড় করছি, একটু  
মুখটা বন্ধ কর...



আ-আমি একটু  
বাথরুম থেকে  
আসছি...

chitrochor.blogspot.com





রোশাঁক...

জানি তোমার সাথে আমার কখনওই বনিবনা ছিল না, কিন্তু আমার সম্পর্কে এতটাও খারাপ কথা বোলো না।

কেউই আমায় অবসর নিতে বাধ্য করেনি। কিন আইন জারি হওয়ার দু'বছর আগে আমি নিজেই মুখোশ-পোশাক ছেড়ে জনসাধারণের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করার সিদ্ধান্তটা নিই।

[chitrochor.blogspot.com](http://chitrochor.blogspot.com)

হ্যাঁ। ভাল সময়ই বেছেছিলে।

আমি তোমায় খুনির ব্যাপারে সতর্ক করতে এখানে এসেছিলাম। যাতে লাশকাটা ঘরের সবথেকে চালাক লোক হিসেবে তোমার জীবনটা যেন শেষ না হয়।

তবে আমার মনে হয় এর থেকেও অনেক খারাপ ভাবে জীবন শেষ হয়ে থাকে।

চলি, আবার দেখা হবে।

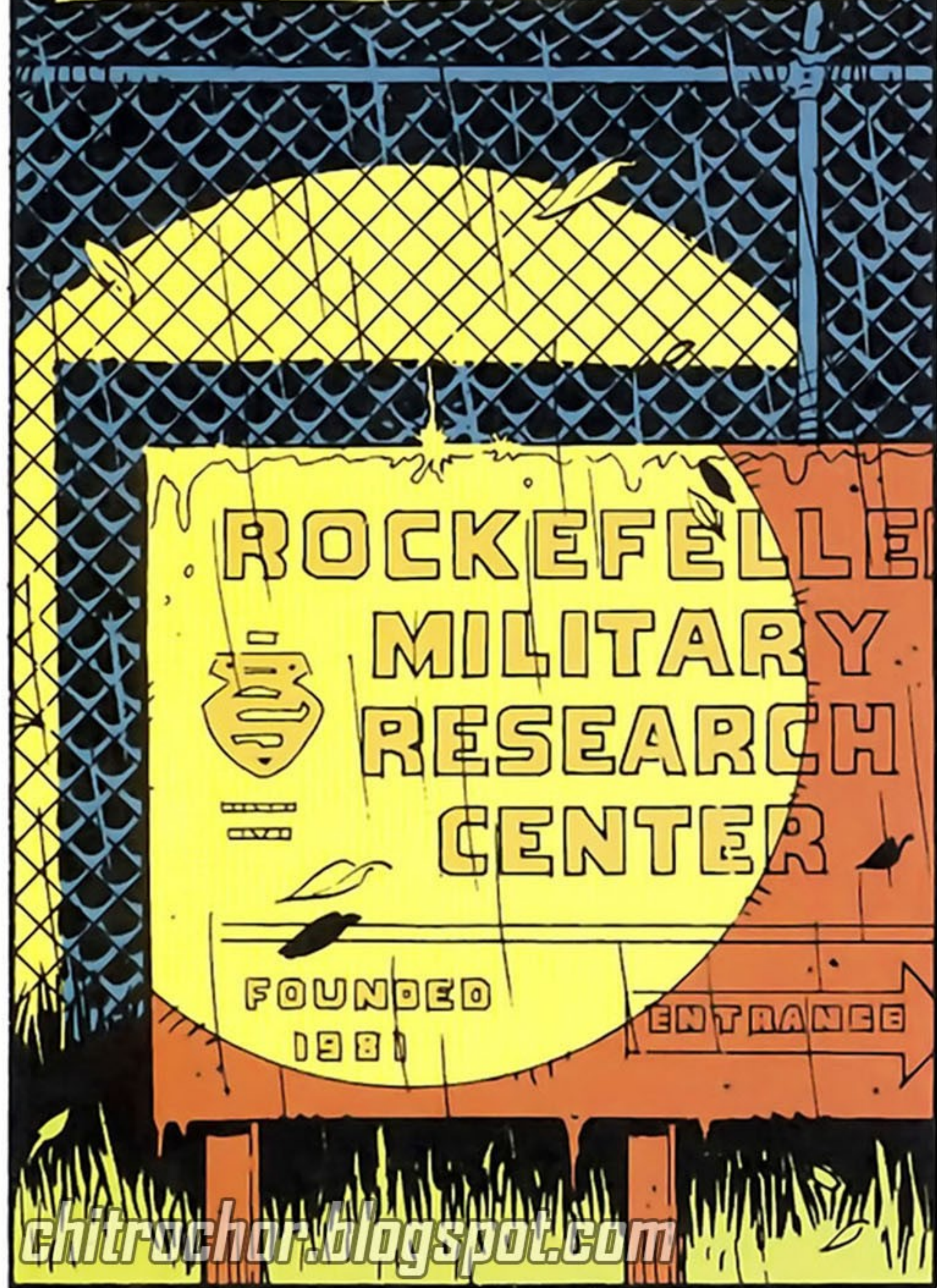
তা তো হবেই।

ভাল থেকো।

chitrochor.blogspot.com



রোশাকের রোজনামা, ১৩ই অক্টোবর,  
১৯৮৫। সন্ধ্যা ৮.৩০।



chitrochor.blogspot.com

ডেইটের সাথে দেখা করে মুখটা তেতো  
হয়ে গেছে। গুর অহং ভাবটা বড় বেশি,  
এমনকী ও নিজের উদার মেধি মনোভাবের  
প্রতিও অবিচার করছে।



ও কি অমকামী নাকি?  
পরে এ-ব্যাপারে ডাল:  
করে খোঁজখবর নিতে  
হবে।

ডাইবর্গের সাথে দেখা করেও কোনও  
লাভ হয়নি। নিষ্কন্মা ছিঁচকাঁদুনে কোথাকার,  
ঘরে বসে ব্যর্থতার বুলি আঙুরানো ছাড়া  
আর কিম্ব্ব করতে জানে না।



আমাদের মধ্যে  
শারীরিক ও মানসিক  
ভাবে সুস্থের সংখ্যাটা  
এত কম কেন?

প্রথম নাইট আউটকে  
এখন গাড়ি আরিয়ে  
পেটে চালাতে হয়।



প্রথম সিন্দে স্পেক্টর  
এখন এক মুটকি বেশ্যায়  
পরিণত হয়েছে, ক্যালি-  
ফোর্নিয়ার এক বৃদ্ধাশ্রমে  
মে-বুড়ি এখন মরার  
দিন শুনছে।

চুম্বাক্তরের এক  
গাড়ি দুহুটনায় ক্যাপ্টেন  
মেট্রোপলিটের তো মুখুই  
উড়ে গেছিল।

মথম্যানের  
ঠিকানা এখন  
পাগলাগারদ।



মিথুয়েট অপমানে  
অবসর নিয়েছিল,  
ছ'মাসের পর গুর এক  
মামুলি শত্রু গুকে খুন  
করে বদলা নেয়।

ডলার বিলকে শুদ্ধি  
করে খুন করা হয়।  
পঞ্চান থেকে গুডেড  
জাস্টিসের আর  
কোনও খোঁজখবর  
নেই।

chitrochor.blogspot.com

এদিকে কমেডিয়ানও  
মারা গেল।



আমার লিফটে এখন শুধুমাত্র  
দু'জনের নাম বাকি আছে।



দু'জনেই এখন  
রকফেলার মিলিটারি  
রিমোর্ট অ্যেন্টারে থাকে।

গুদের দু'জনের  
কাছে যেতে  
হবে।

গুই অবিশ্বাস লোকটাকে গিয়ে  
বলতে হবে কেউ গুকে খুন করার  
মতলবে আছে।

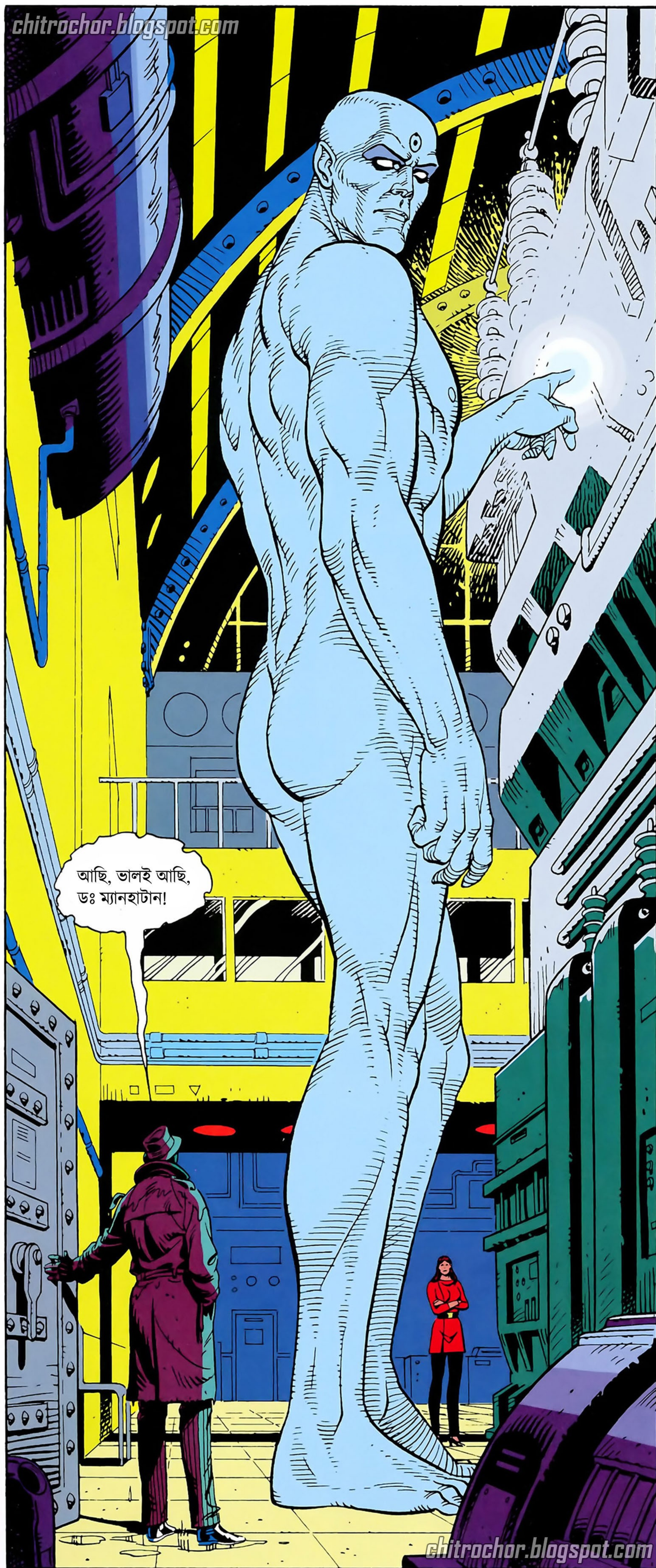


CLEAR  
2 ONLY  
KEEP

কেমন আছো,  
রোশাক?



chitrochor.blogspot.com



আছি, ভালই আছি,  
ডঃ ম্যানহাটন!



তুমি এখানে কী করছ,  
রোশাক? এটা সরকারি  
জায়গা, আর আমি তো  
শুনেছি পুলিশ তোমায়  
নাকি পাগলের মতো  
খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওহো...

কেমন আছে,  
মিস জুপিটার?!



মিস জাম্পেকজিক।  
'জুপিটার' আমার মা  
ব্যবহার করত, কেউ  
যাতে ধরতে না পারে  
মা'র বাড়ি আসলে  
পোল্যান্ডে ছিল।

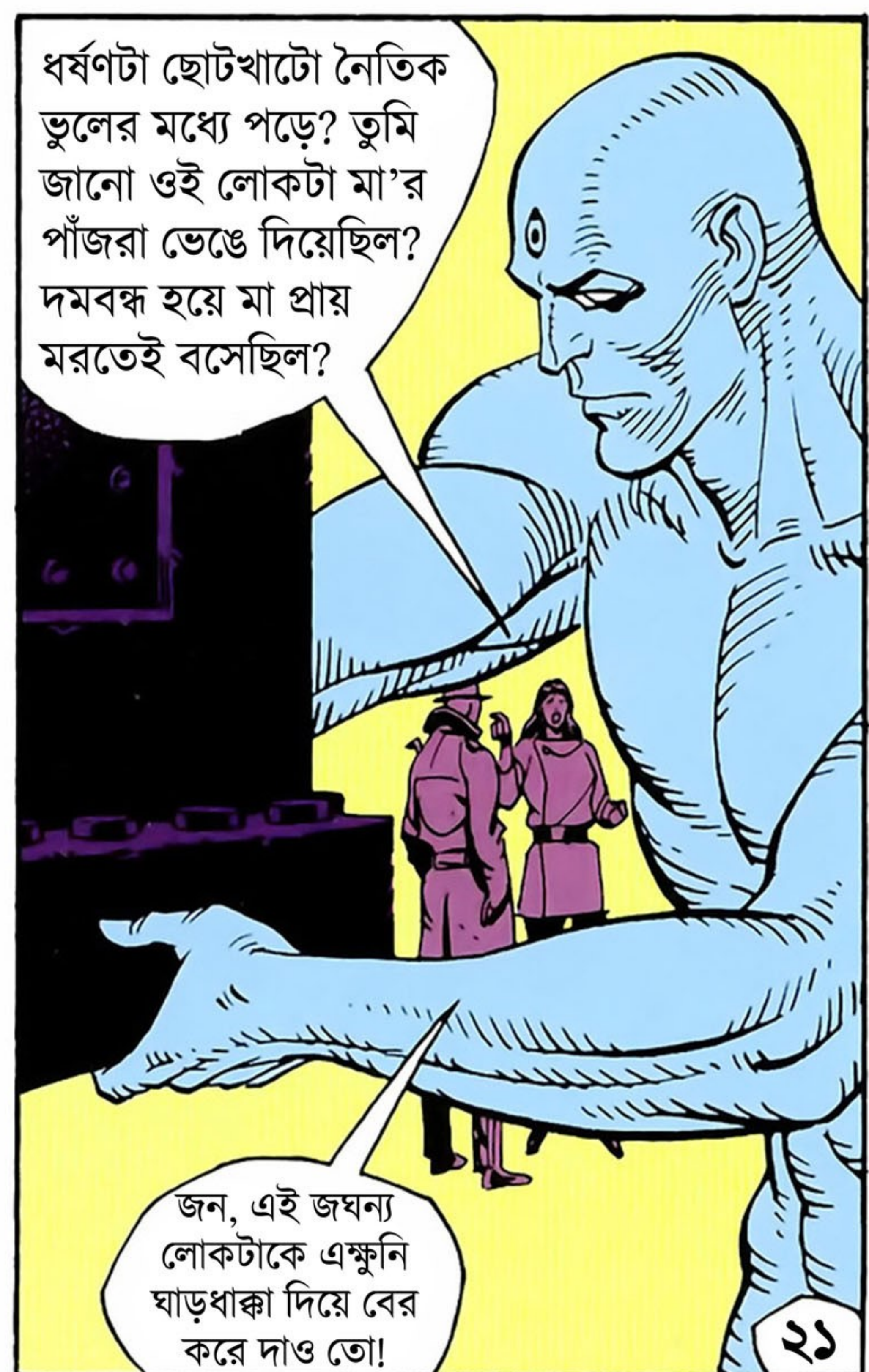
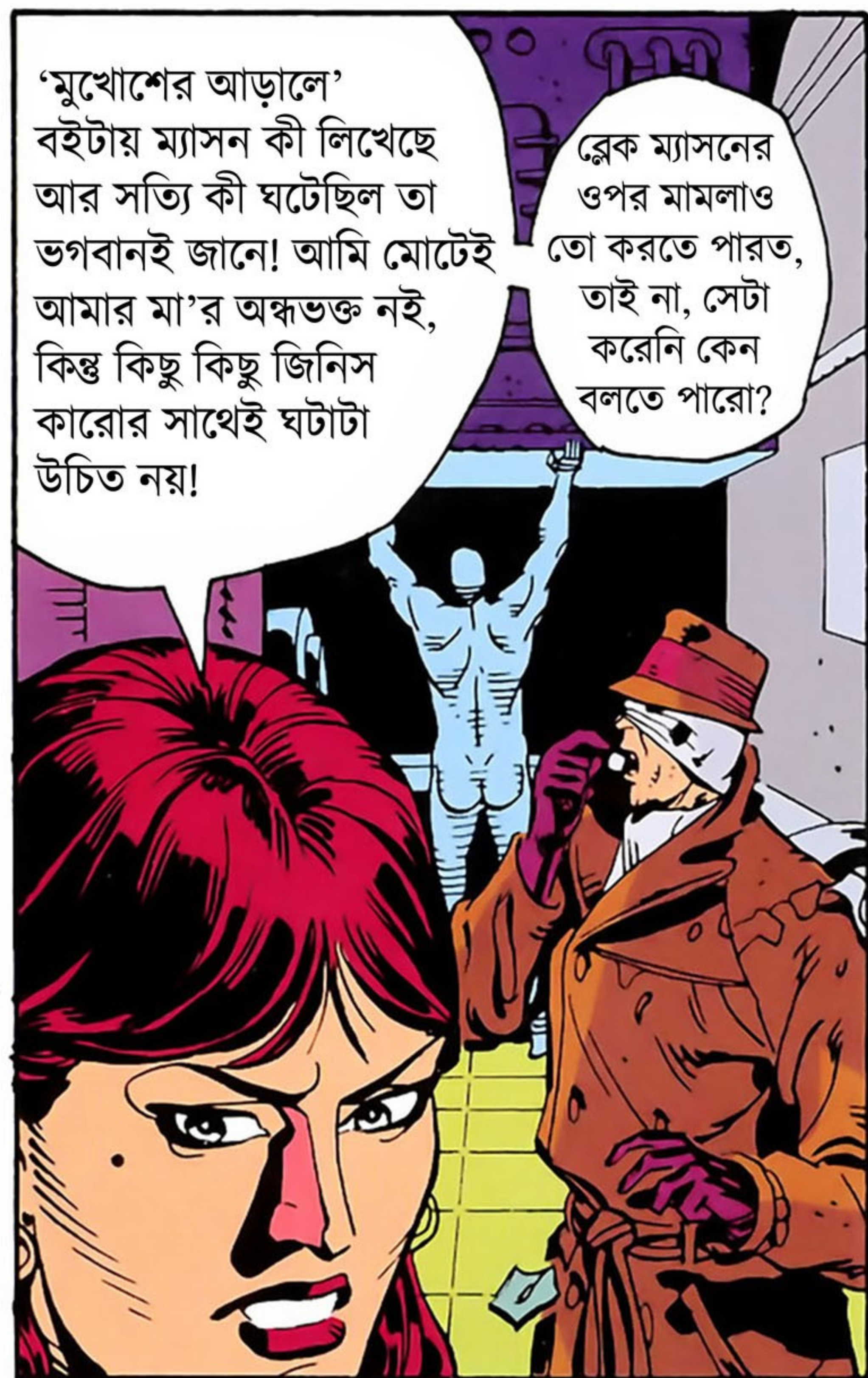
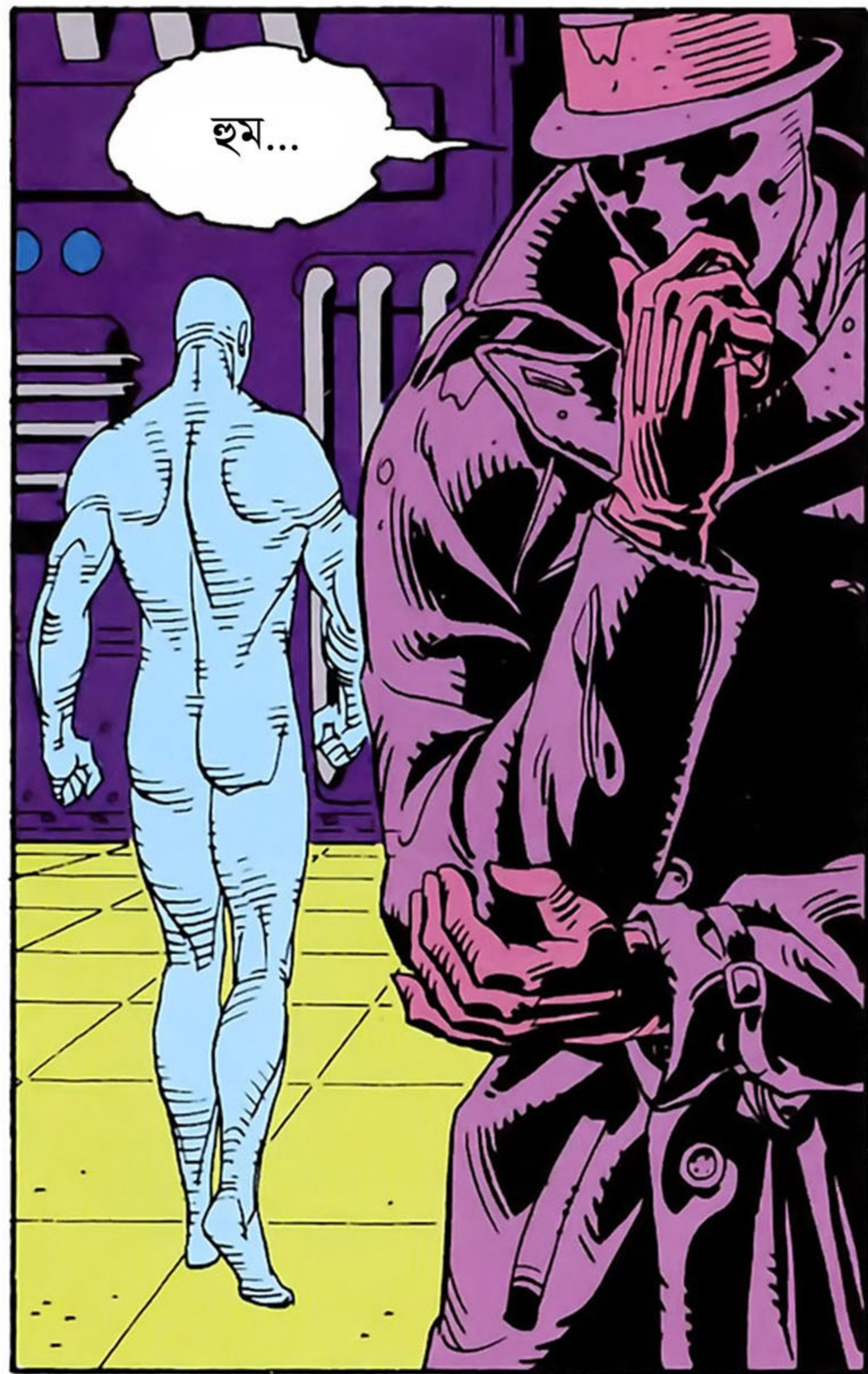
তুমি কিন্তু এখনও আমার  
প্রশ্নের উত্তর দাওনি।

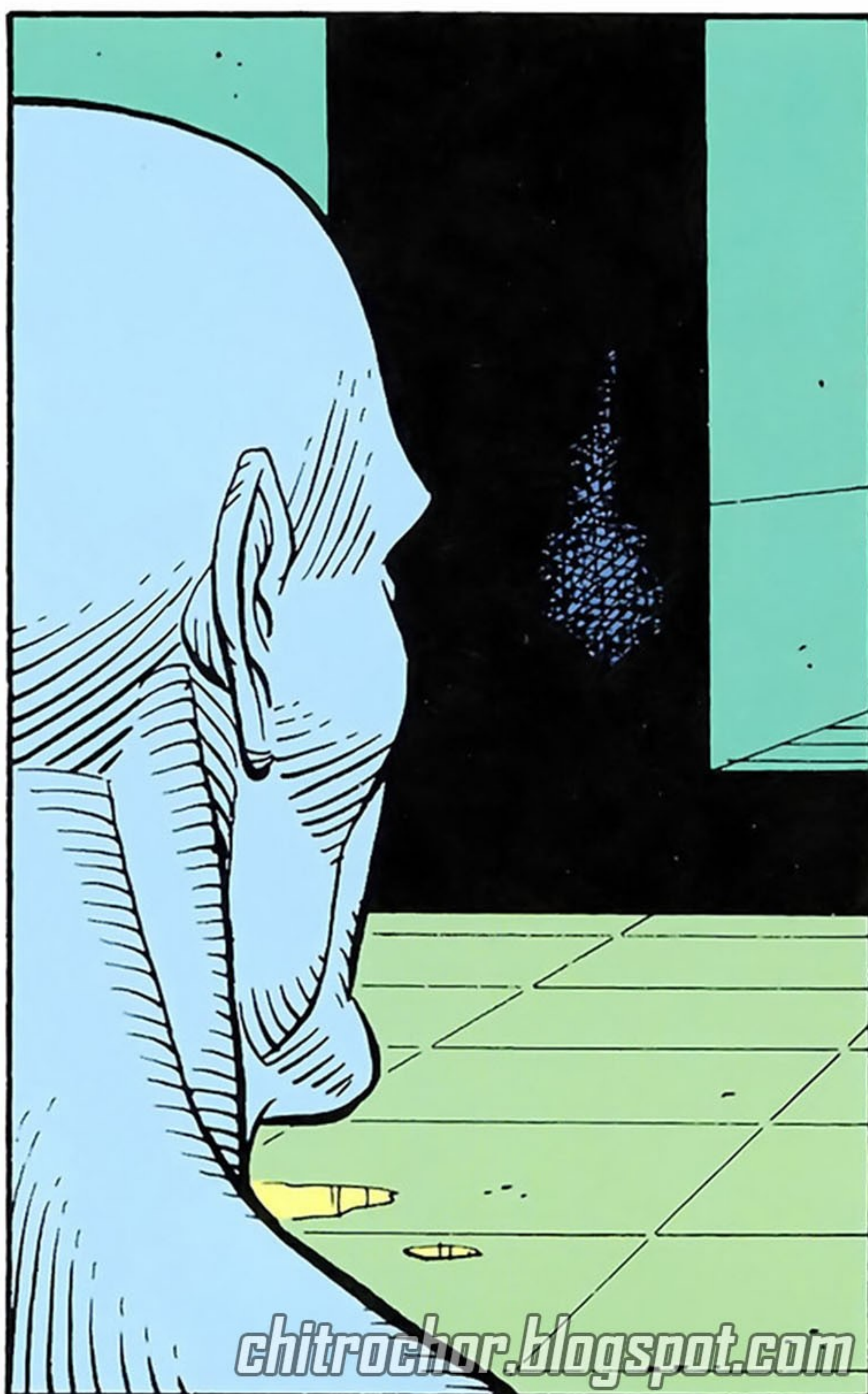


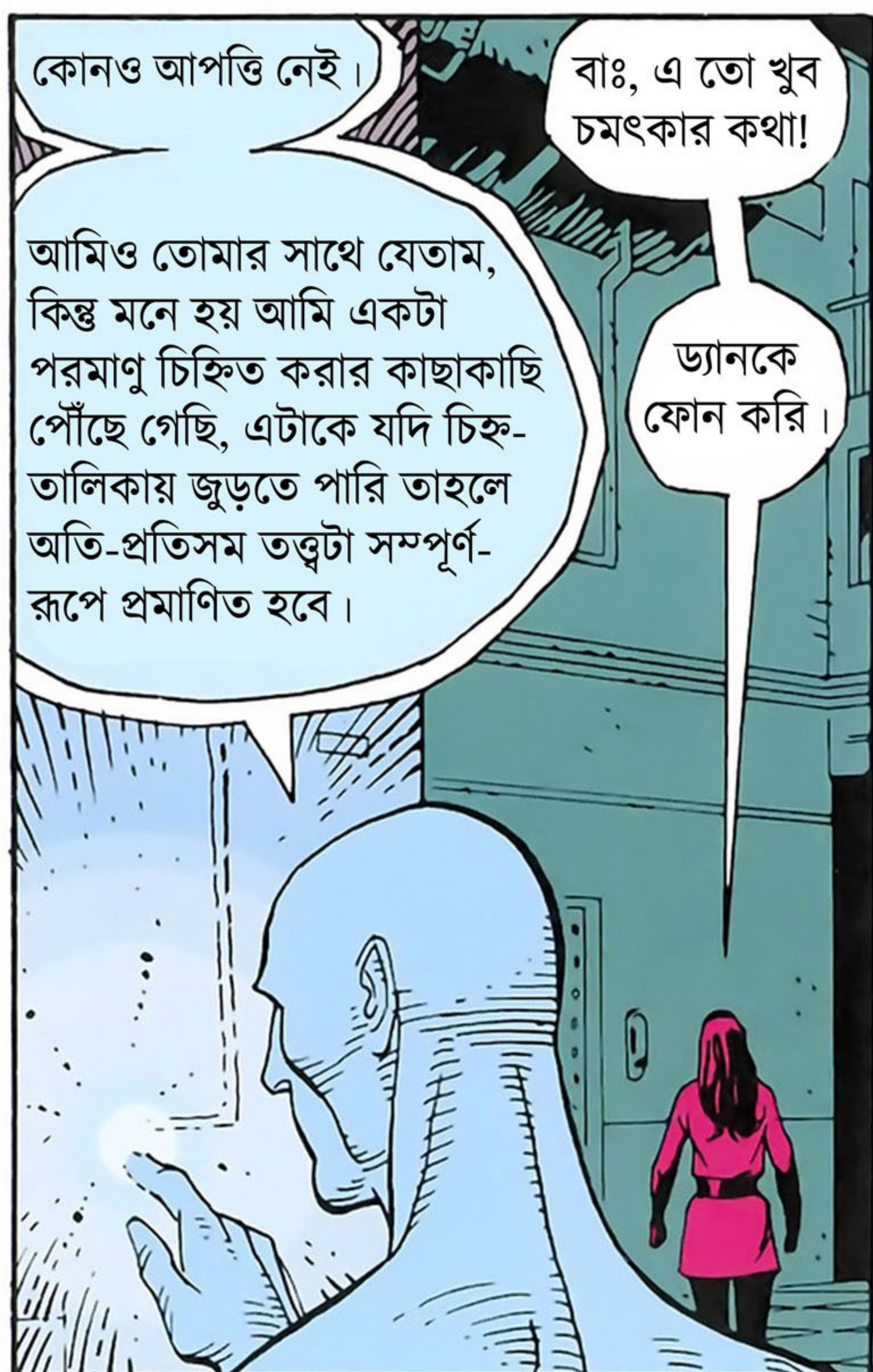
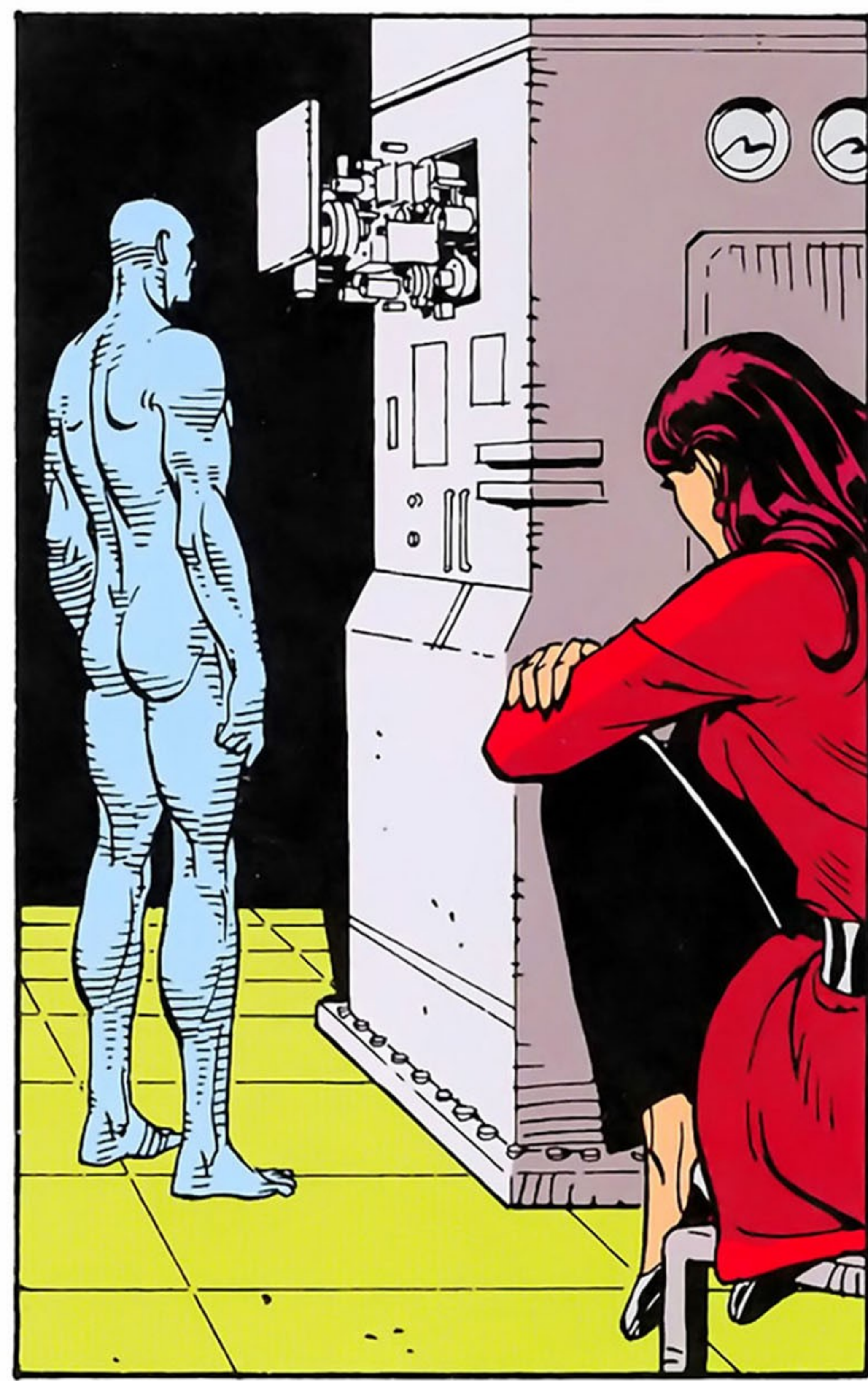
মাফ চাইছি!

তোমরা এবার  
থেকে একটু সাবধানে  
থেকো, একটা খারাপ  
খবর আছে।

কমেডিয়ান  
মারা গেছে।









শুক্রবার রাতে নির্ভয়ক শহরে  
কমেডিয়ান মারা যায়।



ভুকে কেউ জানলো থেকে ছুড়ে ফেলে  
দিচ্ছে, ফুটপাথে আছড়ে পড়ার পর  
গুর মাথাটা পেটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে  
গেছিল।



কারোর কিম্বদন্তি যাম  
আমে না এতে।

একমাত্র  
আমি ছাড়া।



গুরাই কি তাহলে  
ঠিক? এ অবই দল  
শ্রম?

যুদ্ধের অশনিমংক্রেত  
ঘনিষে আসছে। লাথ লাথ  
মানুষ জ্বলে পুড়ে ছারখার  
হয়ে যাবে। বাকিরা অব মহা-  
মারিতে খুঁকে খুঁকে মরবে।

মৃত্যুর এই মহা-  
মিছিলে কেই-বা  
একজনের মারা  
যাওয়া নিয়ে মাথা  
দামাবে?



দুনিয়ায় ডালমানুষের মাথে শয়তানও বাস  
করে, শয়তানকে তো শাস্তি দেতেই হবে।  
ডাল ও মন্দের শেষ যুদ্ধের সময়ও আমি  
এ নিয়ে আন্দোল করব না।

এ দুনিয়ায় কুকর্মের  
শাস্তির জন্য যোগ্য  
লোকের অভাব নেই...



...এদিকে আবার হাতে  
অময়েরও খুব অভাব।



মনে হয় অনেক  
রাত হয়ে গেছে।

সন্ধ্যোটা দারুণ কাটল,  
ল্যরি। খাবারের দামটা  
আমি দিলে কী অসুবিধা  
ছিল বলো তো?



না। আমাকে যদি সেনাবাহিনীর  
বিশেষ মারণাস্ত্রের রক্ষিতার নজরেই  
দেখা হয়, তাহলে মাঝেমাঝে সে  
রক্ষিতার এক বাটি স্প্যাগেটি  
অ্যাফ্রিকেনের দাম মেটানোর  
ক্ষমতাও সেনাবাহিনীর থাকা  
উচিত।

এই, এমন করে  
কেন বলছ? একটুও  
ভাল লাগছে না কিন্তু!



না।  
ভাল লাগার কথাও নয়।  
জনকে শান্তি আর সুখ দেওয়ার  
জন্যই আমায় ওর কাছে  
রাখা হয়েছে।

ইয়ে... তোমার আর  
জনের মধ্যে সব ঠিকঠাক...?



আমি আর জন?

ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,  
সব ঠিকঠাক আছে!

এর থেকে ভাল সময় আমরা  
এর আগে কাটাইনি!



শুধু একটাই কাঁটা খচখচ করে— “পঁয়ত্রিশ  
বছরের জীবনে কী করলাম আমি?”

আট বছর হয়ে গেল  
অবসর আর কাজের  
মাঝখানে ঝুলে আছি। তার  
আগে দশ বছর ধরে মুখোশ-  
পোশাক পরে সঙ সেজে ঘুরেছি,  
কেননা আমার নির্বোধ মা'র  
সেটাই হচ্ছে ছিল!



আমার সেই পোশাকটার কথা  
তোমার মনে আছে?

শর্ট-স্কার্টের চেয়েও খাটো  
স্কার্ট আর গলার ঝুলটা  
নাভি পর্যন্ত কাটা।  
উফ, কী ভয়ঙ্করই-না ছিল!

হ্যাঁ, সত্যিই  
ভয়ঙ্কর।

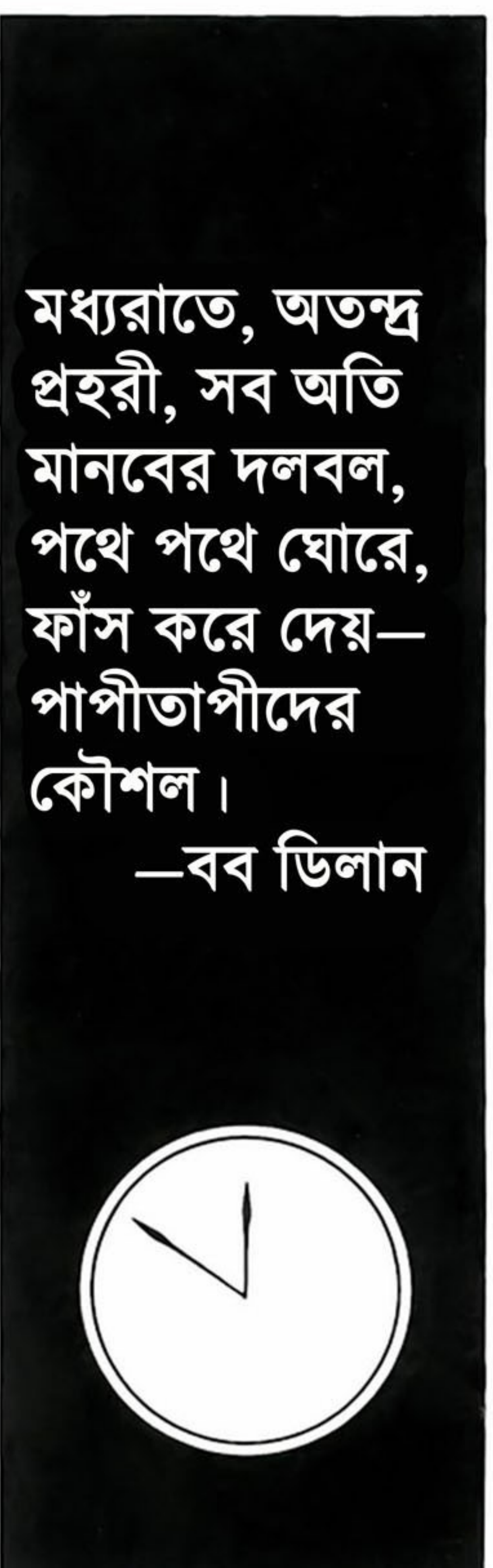


জানো, তখনকার কথা মনে পড়লে মনে  
হয়... কেনই-বা আমরা ওসব করতাম?  
কেনই-বা আমরা অমন পোশাক পরতাম?

কিন আইন জারি  
হয়ে একদিকে  
ভালই হয়েছে।

হুম... হয়তো  
তোমার কথাই  
ঠিক।





# মুখোশের আড়ালে

chitrochor.blogspot.com

এখানে হলিস ম্যাসনের আত্মজীবনী 'মুখোশের আড়ালে'র কিছু অংশ তুলে ধরা হল। এই বইটি উনি যখন মুখোশধারী নাইট আউল ছিলেন সে-সময়কার ঘটনাবলী নিয়ে লেখা হয়েছে। উদ্ধৃত অংশগুলি লেখকের অনুমতি নিয়ে পুনরায় ছাপানো হয়েছে।

১

গলির মুখের মুদিখানাটায় যে মহিলাটি কাজ করে তার নাম ডেনিস, ওকে আমেরিকার সবথেকে সেরা অপ্রকাশিত ঔপন্যাসিক বললেও কম বলা হবে। আজ পর্যন্ত ডেনিসের প্রায় বিয়াল্লিশটা প্রেমের উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে, যা এখনও পর্যন্ত বইয়ের দোকানের মুখ দেখেনি। দোকানে কফি বা কড়াইশুঁটির কৌটো কিনতে গেলে ডেনিসের নিজের মুখ থেকেই ওর শেষ সাতাশটা উপন্যাসের খসড়ার সবিস্তার বর্ণনা শোনার সৌভাগ্য আমার হামেশাই হয়ে থাকে, তাতে ডেনিসের সাহিত্য দক্ষতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিনকে দিন বাড়তেই থাকে। তো খুব স্বাভাবিক ভাবেই যে বইটা এখন আপনি পড়ছেন সেটা লেখার সময় হিমশিম খেয়ে আমি ডেনিসের কাছে পরামর্শের জন্য যাই।

“শোনো না,” একদিন আমি ওকে বললাম। “বই কীভাবে লিখতে হয় সে-বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। মাথায় ভুরি ভুরি কথা আসছে ঠিকই, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কোনও সুরাহা দিতে পারবে?”

ডেনিস মুখ নিচু করে কাজ করছিল, মুখ না তুলেই মুরব্বিদের মতো উদাস অমায়িক গলায় ওর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আমায় ও উপদেশটা দিল।

“সবথেকে দুঃখের কথা দিয়ে শুরু করো, যাতে শুরু থেকেই তোমার ওপর পাঠকের সহানুভূতি জাগে। বিশ্বাস করো, তারপর দেখবে লেখা আর থামতেই চাইছে না।”

ধন্যবাদ, ডেনিস। এই বইটা আমি তোমায় উৎসর্গ করছি, বাকি যাদের উৎসর্গ করব ভেবেছিলাম তাদের মধ্যে বাছাই করব কীভাবে বুঝতে পারছিলাম না।

“দ্য রাইড অফ দ্য ভ্যালকিরিজ”— এটার কথা মনে পড়লেই আমার মনখারাপ হয়ে যায়। এটা শুনলেই আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি, মানবজাতি আর জীবনের অন্ধকার দিকগুলোর চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। হজমের সমস্যায় যেমন ভোর তিনটেয় ঘুম না আসার সময় যেসব চিন্তাগুলো মাথায় ভিড় করে আসে, তেমন চিন্তা। এখন আমি বুঝতে পারি এ দুনিয়ার কারোরই এই বিশেষ আলোড়ন জাগানো জিনিসটা শুনে আর চোখের কোল ভিজে ওঠে না। ওরা মো ভার্ননকেও চেনে না।

মন্টানায় ঠাকুরদার খামারবাড়ি ছেড়ে আমার বাবা পরিবার নিয়ে নিউইয়র্কে আসার পর মো ভার্ননের কাছে কাজ করত। ভার্ননের মোটর সারাইয়ের গ্যারাজটা সাত নম্বর রাস্তার উপরেই ছিল। বাবা ১৯২৮ সাল থেকে ওখানে কাজ করা শুরু করে। বাবা যা মজুরি পেত তাতে আমার, মা'র আর বোন লিয়াস্তার ভাতকাপড় জোগাতে অসুবিধে হয়নি। বাবা নিজের কাজ নিয়ে খুব উৎসাহী ছিল, আমি তখন ভাবতাম বাবা গাড়ি জিনিসটাকে ভালবাসে বলেই মনে হয় এমনটা করে। আজ মনে হয় ব্যাপারটা তার থেকেও গভীর কিছু ছিল। একটা কিছু কাজ করে নিজের পরিবারকে ভাল রাখাটাই হয়তো বাবার সবথেকে বড় চাওয়া ছিল। খামারবাড়ির দায়িত্ব ছেড়ে পূর্ব আমেরিকায় আসা নিয়ে বাবার ঠাকুরদার সাথে অনেক বার ঝগড়া হয়েছিল। আর সেসব ঝগড়ার বেশিরভাগগুলোই আমার বাবা-মা নিউইয়র্কে গেলে অভাবে ভুগবে, নৈতিক অবক্ষয় হয়ে যাবে— ঠাকুরদার এসব ভবিষ্যৎবাণীতে গিয়ে শেষ হতো। ঠাকুরদার বারণ সত্ত্বেও নিজের বেছে নেওয়া সে-জীবনে পরিবারকে অভাবে ভুগতে না দেওয়ার চিন্তাটা বাবাকে দুনিয়ার বাকি সবকিছুর থেকে বেশি পীড়া দিত। কিন্তু সেটা আজ বড় হওয়ার পর বুঝতে পারি, তখন আমি ভাবতাম বাবা বুঝি মোটরের ইঞ্জিনগুলোকে নিজের থেকেও বেশি ভালবাসে।

আমার বারো বছর বয়সে আমরা মন্টানা ছেড়ে নিউইয়র্কে আসি। নিউইয়র্কে আসার পর কয়েক বছর ধরে আমি বাবার সাথে মাঝেমধ্যেই বাবার কাজের জায়গায় যেতাম। সেখানেই আমি আমার বাবার মালিক মো ভার্ননকে প্রথম বার দেখি।

মো ভার্ননের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের আশেপাশে ছিল, আর ওর মতো পুরনো ধাঁচের মুখ আজকাল আর নিউইয়র্ক শহরে দেখা যায় না। ব্যাপারটা শুনতে মজার লাগলেও, কিছু-কিছু এমন মুখ আছে যেগুলো কালের চক্রে কোথায় জানি হারিয়ে যায়। পুরনো দিনের ছবিগুলো দেখলে আপনি সবার মুখেই অমন ধরনের ছাঁচ দেখতে পাবেন, মনে হবে যেন সবাই একে অপরের আত্মীয়। দশ বছর পরে আপনি সেই ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার আশেপাশে নতুন ধরনের মুখের আনাগোনা বেড়ে গেছে। সেই পুরনো মুখগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, যেন তাদের আর কখনওই দেখা যাবে না। মো ভার্ননের মুখটা ঠিক ওই ধাঁচেরই ছিল— তিনটে চিবুক, ঠোঁটের নীচে গভীর ভাঁজ, চোখের গর্তটা একটু বেশিই ঢোকা, মাথার সামনের দিকে টাক পড়া, ঘাড়ের কাছে চুল ছাপিয়ে জামার কলারের কাছে লাট খাওয়া।



ভার্ননের মোটর সারাই গ্যারাজ, ১৯২৮। (বাঁদিক থেকে) আমার বাবা; আমি, ১২ বছর বয়সে; মো ভার্নন; ফ্রেড মোৎজ।

বাবার সাথে আমি মাঝেমধ্যেই মো'র গ্যারাজে যেতাম। মো'র কাজের ঘরটা কাচ ঢাকা ছিল, ঘরটার ভেতর থেকে কে কোথায় কী কাজ করছে সেটার ওপর মো নজর রাখত। কাজের মধ্যে মো'র সাথে কোনও কিছু নিয়ে কথা বলার দরকার হলে বাবা আগে আমাকে দিয়ে সে-খবরটা পাঠাত, এভাবেই আমি মো'র সেই কাচ ঢাকা 'খাসকামরা'র ভেতরটা দেখার সুযোগ পাই। বা বলা ভাল, শোনার সুযোগ পাই।

আসলে, মো অপেরা শুনতে খুবই ভালবাসত। ওর কাজের ঘরের এক কোণে একটা ঝাঁ চকচকে গ্রামোফোন বসানো ছিল। গোটা দিনটা মো ওর পুরনো হয়ে যাওয়া প্রিয় সেভেন্টি-এইট আরপিএম রেকর্ডগুলো যতটা জোরে পারে বাজিয়ে শুনত। আজকের দিনের হিসেবে "যতটা জোরে পারে" মানে গাঁকগাঁক করে বাজানো নয়, কিন্তু ১৯৩০ সালের হিসেবে, যখন সবকিছুর মধ্যেই বেশ একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব ছিল, সে-আওয়াজ বেশ কর্কশই ছিল বলা যায়।

মো'র আরেকটা বিশেষ বাতিক ছিল, ওর ডেস্কের ডানদিকের উপরের ড্রয়ারে ও কিছু বিশেষ জিনিস জমিয়ে রাখত।

সেই ড্রয়ারে রবার ব্যান্ড, পেপার ক্লিপ, রসিদ আর হাজারোটা জিনিসের মধ্যে মো এমন কিছু মামুলি কিন্তু অভিনব জিনিসের বিশাল সম্ভার বানিয়েছিল যা আমি আজ পর্যন্ত কারোর কাছে দেখিনি। বিভিন্ন দোকান বা কোনি আইল্যান্ডের মেলা থেকে সংগ্রহ করা ছোট ছোট খেলনা বা টুকিটাকি মামুলি জিনিস। জিনিসগুলোর আকার-আকৃতির নির্ভেজাল নিপুণ সাদৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়— তাদের সস্তা ম্যাজিক দেখে ছোটবেলায় বাবার কিনে দেওয়া তাদের ম্যাজিকের খেলার কথা মনে পড়ে যাবে; এমন একটা বলপয়েন্ট পেন যাতে সাঁতারের পোশাক পরা একটা মেয়ের ছবি আছে, পেনটা উল্টো করলেই সাঁতারের পোশাকটা গায়েব হয়ে যায়; লবণদানি আর মরিচদানিগুলো মহিলাদের স্তনের মতো দেখতে; একতাল প্লাস্টিক যেগুলো দেখে কুকুরের পায়খানা বলে মনে হবে। ওর কাজের ঘরটায় কেউ ঢুকলেই মো তাকে এসব জিনিসগুলো দেখিয়ে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করত। সত্যি বলতে কী, জিনিসগুলো দেখে আমার থেকেও বেশি আমার বাবা চমকে উঠত। বাবা বোধহয় চাইত না তার ছেলে এমন ধরনের কোনও জিনিস দেখুক। হয়তো আমার ঠাকুর্দার নৈতিক সতর্কবাণীগুলো বাবার ওপর কোনও গভীর ছাপ ফেলেছিল। আমার কিন্তু বাবার উপর রাগ হতো না, বরং ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুতই লাগত। না, জিনিসগুলো দেখে নয়... এমন ধরনের জিনিস দেখে অবাক হওয়ার মতো বয়সও তখন আমার আর ছিল না। আমার যেটা অদ্ভুত লাগত কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া একটা আধবুড়ো লোকের এসব উদ্ভট জিনিস জমিয়ে লাভটা কী হতো এই ভেবে।

যাইহোক, ১৯৩৩ সালে আমার সতেরোতম জন্মদিনের কিছুদিন পর আমি একদিন ভার্ননের মোটর সারাই গ্যারাজে বাবার কাজে সাহায্য করছিলাম। মো ওর কাজের ঘরটাতেই ছিল। চিঠি দিতে এলে যেন কিস্তি জিনিসটা দেখে হেসে ওঠে সেজন্য মো রবারের বানানো একজোড়া কৃত্রিম স্তন পরে পিয়নের অপেক্ষা করছিল (ব্যাপারটা আমরা পরে জেনেছিলাম)। জিনিসটাকে এত নিপুণ ভাবে রং করা হয়েছিল যে সেটা আসল না নকল বোঝাই যাচ্ছিল না। এই অপেক্ষার সময়টাতে মো'র গ্রামোফোনে ওয়াগনার বাজছিল।

সময়মতো চিঠিপত্র নিয়ে আসার পর পিয়ন মো'র বিশাল বক্ষের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চিঠিপত্রের মধ্যে (এটাও আমরা পরে জানতে পারি) মো'র স্ত্রী বেট্রিসের একটা চিঠি ছিল, যাতে লেখা ছিল বেট্রিসের নাকি গত দু'বছর ধরে ফ্রেড মোৎজের সাথে অবৈধ সম্পর্ক চলছে। ফ্রেড ভার্ননের মোটর সারাই গ্যারাজের সবথেকে পুরনো এবং সবথেকে বিশ্বস্ত মিস্ত্রি। যে কিনা খুবই উল্লেখযোগ্য ভাবে সেই বিশেষ দিনটিতে কাজে আসেনি। চিঠিতে এ-কথা জানানোর কারণ হল, বেট্রিস নাকি তাদের (মো ও বেট্রিসের) জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা তুলে ফ্রেডের সাথে টিফ্যানায় পালিয়ে যাচ্ছে।

এরপর মো'র দড়াম শব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে আসা ও 'রাইড অফ দ্য ভ্যালকিরিজ'-এর প্রচণ্ড আওয়াজে গ্যারাজের সবাই সেদিকে মুখ তুলে তাকায়। চোখে জল ও হাতে দোমড়ানো চিঠিটা ধরে মো গ্যারাজের সবার দৃষ্টির সামনে নাটকীয় ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখনও ও সেই কৃত্রিম স্তনজোড়া পরে আছে। প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে, আস্তে আস্তে চড়তে থাকা ওয়াগনারের সঙ্গীতকে পেছনে রেখে মো মুখ খুলল— প্রচণ্ড বেদনা, অপমান ও অসম্মান চেপে রেখে কথাগুলো বলতে হচ্ছিল বলে শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর গলা ধরে গেছিল।

“ফ্রেড মোৎজ গত দু'বছর ধরে আমার বউ বেট্রিসের কাছে শারীরশিক্ষার পাঠ নিচ্ছে।”

কথাগুলো বলে মো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। চোখের জল ওর তিন ধাপ চিবুক বেয়ে রবারের কৃত্রিম গোলাপি স্তনের মধ্যে গড়াতে লাগল। বুক থেকে উঠে আসা চাপা দীর্ঘশ্বাস ভ্যালকিরিজের উত্তাল আগমনে আরও চাপা পড়ে গেল।

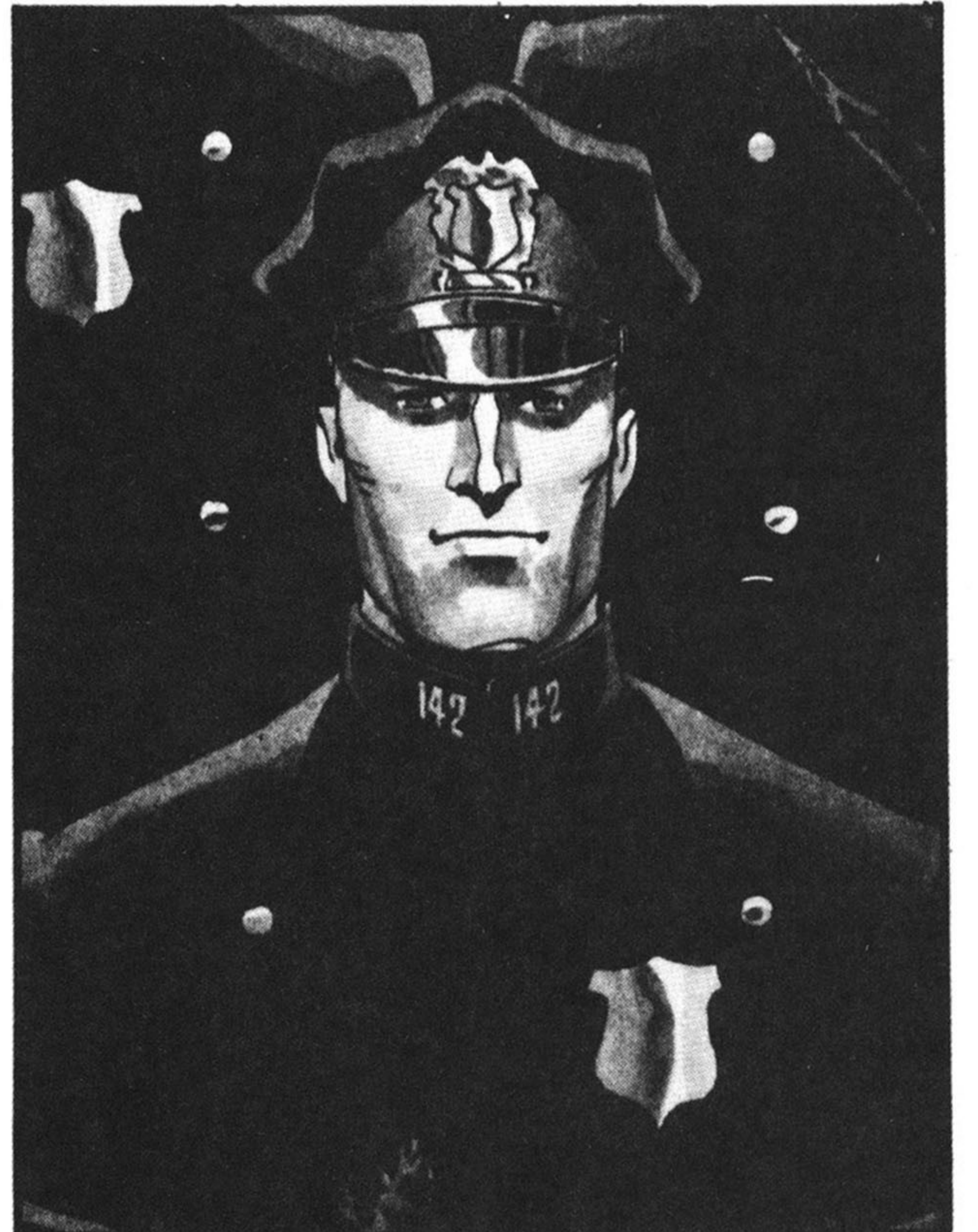
সবাই এবার হো-হো করে হেসে উঠল।

সবার এমনটা করার কারণ কী, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। আমরা সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম মো কাঁদছিল। কিন্তু উদাস ভঙ্গিতে ওর কথাগুলো বলা, একজোড়া নকল স্তন পরে থাকা, ঘরটা থেকে বিপর্যয়ের জয়োল্লাসের মতো ধৈর্যে আসা সঙ্গীত, সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা এমন তৈরি হয়েছিল যে আমরা কোনওমতেই হাসি চাপতে পারিনি। বাবা আর আমি দু'জনেই হাসির দমকে পেট চেপে বসে পড়েছিলাম। কেউ কেউ ঘটনাটা দেখার জন্য গাড়ির ডিকির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকেরই হাসির চোটে বেরিয়ে আসা চোখের জল মুছতে গিয়ে হাতের তেলকালি সারা মুখে লেগে গিয়েছিল।

মো কিছুক্ষণ আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ওর কাজের ঘরটায় ঢুকে গিয়েছিল। মিনিট দুয়েক পরে একটা বিচ্ছিন্ন ঘঘটানির আওয়াজ তুলে গ্রামোফোনে বাজতে থাকা ওয়াগনার থেমে গিয়েছিল। তারপর সব চুপচাপ।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কেউ একজন সবার হয়ে মো'র কাছে ক্ষমা চাইতে যায়। মো সবাইকে ক্ষমাও করে দেয়। সে-লোক জিজ্ঞেস করাতে মো বলে ও একদম ঠিক আছে, কিছু হয়নি। বাস্তবিকই, মো তখন ওর ডেস্ক-চেয়ারটায় বসে, কৃত্রিম স্তনজোড়াটা খোলা অবস্থায়, প্রতিদিনকার মতো কাগজপত্র নাড়াঘাটা করতে করতে কাজ করছিল। যেন সত্যিই কিছু হয়নি।

মো সেদিন সবাইকে তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। সবাই চলে যাওয়ার পর ইঞ্জিন চালু করলে যেন ধোঁয়া ভেতরে ঢোকে এমন ব্যবস্থা করে গ্যারাজের সারাই করতে দেওয়া একটা গাড়ির মধ্যে সবক'টা জানলা বন্ধ করে বসে মো সে-গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে। গাড়ির মধ্যে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইডের ধোঁয়ায় তীব্র বেদনায় ছটফট করতে করতে মো অস্তিম নিদ্রায় ঢলে পড়ে। মো মারা যাওয়ার পর ওর ভাই ব্যবসার হাল ধরে। সবচেয়ে মজার কথা হল ফ্রেড মোৎজ আবার কাজে যোগ দেয়, একই পদে, সবথেকে পুরনো ও সবথেকে বিশ্বস্ত মিস্ত্রি হিসেবে।



*chitrochor.blogspot.com*

ঠিক একারণেই “দ্য রাইড অফ দ্য ভ্যালকিরিজ” শুনলেই আমার মনটা খারাপ হয়ে ওঠে। অবশ্য আমার থেকে বেশি অন্য কারোর করুণ পরিণতি জড়িয়ে আছে এর সাথে, তবুও নিজেকে আমি বিষণ্ণ হয়ে ওঠা থেকে আটকাতে পারি না। সেদিন গ্যারাজে আমিও ছিলাম, আমিও বাকি সবার সাথে তাল মিলিয়ে হাসছিলাম। আমার মনে হয় এটাই আমার গল্পের সবথেকে দুঃখের অংশ।

যদি ডেনিসের কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে বোধহয় আমি আপনার সহানুভূতি পেয়ে গেছি আর এবার আমার লেখা থামাও উচিত নয়। আপনি যা পড়ার জন্য এই বইটা কিনেছেন সেটা আগেভাগে বলে দেওয়াটাই বোধহয় ভাল হবে। মো ভার্ননের থেকে আমার যে আরেক ধাপ বেশি মাথাখারাপ সেটাও বোধহয় আগেভাগে বলে দেওয়াটা ভাল হবে। আমার কাছে হয়তো মো’র মতো এক ড্রয়ার ভর্তি উদ্ভট খেলনাপাতি না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মারপ্যাঁচওলা কথার বুলি আছে। মো’র মতো আমি হয়তো জীবনেও কখনও একজোড়া নকল স্তন পরিনি, কিন্তু আমি উদ্ভট পোশাক পরেছি, কেঁদেছি, চোখের সামনে কাউকে হাসতে হাসতে মারা যেতে দেখেছি।

## ২

১৯৩৯ সালে আমার তেইশ বছর বয়সে আমি নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ফোর্সে চাকরি পাই। এই বিশেষ চাকরিটাকেই বাছলাম কেন, সে-ব্যাপারে এর আগে কখনও তেমন একটা মাথা আমি ঘামাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় এটার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। সবথেকে বড় কারণটা হয়তো আমার ঠাকুর্দা।

এই বুড়ো লোকটাকে যদিও আমি আমার বাবার উপর দোষারোপ, মানসিক চাপ এবং পাল্টা অভিযোগ-অনুযোগ করায় দায়ী করেছি। আমার মনে হয় আমার জীবনের প্রথম বারোটা বছর ঠাকুর্দার সাথে থাকাটা আমার উপরে বেশ পরিমাণে একটা মানসসম্মান ও নৈতিক মানের এক গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল। আমার ঈশ্বরে তেমন একটা ভক্তি বা বিশ্বাস ছিল না। না পরিবারের প্রতি, না দেশের প্রতি, কোনওটার প্রতিই আমার তেমন একটা অন্ধভক্তি ছিল না। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা এগুলো খুব মেনে চলত, আজকের দিনে আমার মধ্যে যেটুকু ভক্তি-বিশ্বাসের ছাপ আছে সেটা সম্পূর্ণ ঠাকুর্দার কল্যাণে। আমার ঠাকুর্দার নাম ছিল হলিস ওয়ার্ডসওয়ার্থ ম্যাসন। বাবার নামে নাতির নাম রাখার কারণেই হয়তো আমার ঠাকুর্দা আমাকে মানুষ করা ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একটু বিশেষ জোর দিয়েছিল। যে শিক্ষার মধ্যে কয়েকটা কথা ঠাকুর্দা বারবার বলত— পাড়াগাঁ’র লোকেরা শহরের লোকেদের থেকে নীতিগত দিক দিয়ে বেশি ভাল, শহর হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে সারা দুনিয়ার শয়তানি, লোভ, লালসা, নাস্তিকতার নোংরা আবর্জনা গিয়ে জমা হয় আর সে-আবর্জনা জমতে জমতে এখন তা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এখন বয়স হওয়ার পর বুঝতে পারি মন্টানার এই আপাত নিরীহ কিছু কিছু ফাঁকা খামারবাড়ির আড়ালে কত মাতলামো, কত ঘরোয়া জুলুম, কত শিশু নির্যাতন চাপা পড়ে আছে। বুঝতে পারি আমার ঠাকুর্দার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো একটু একতরফা। তা-ও শহরে এসে প্রথম প্রথম আমি এমন কিছু ব্যাপার দেখেছি যা দেখে আমি নীতিগত দিক থেকে এমন ধাক্কা খেয়েছিলাম যে সে-ধাক্কার চোট খুব একটা সহজে সামলাতে পারিনি। সত্যি বলতে কী, এখনও পারি না।

বেশ্যার দালাল, অশ্লীলতার পসারি, আরও কত কী! বাড়িওয়ালার বয়স্ক ভাড়াটের উপর আরও বেশি ভাড়ার জন্য কুকুর লেলিয়ে দেওয়া দেখেছি। বয়স্কদের বাচ্চাদের আদর করার অছিলায় নোংরামি করতে দেখেছি। দেখেছি ধর্ষণকারীর বয়স এতই কম যে তার এখনও গোঁফদাড়ি পর্যন্ত ওঠেনি। আশেপাশের মানুষজনদের দেখে এই দুনিয়াটার অধঃপতনের কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে উঠি আমি। ছোটবেলায় মন্টানায় আমি বাবা-মা’র কাছে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরতাম। সবচেয়ে বড় কথা হল, আমার সে-বায়না যে কোনও কিছুর দাবি জানিয়ে করতাম তা নয়, বরং বেশিরভাগ সময়ই আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই এমনটা করতাম। এমনটা করার কারণ আর কিছুই নয়, এভাবেই বাবা-মাকে কষ্ট দিতে আমার ভাল লাগত। এখন আমার সে-কথা ভেবে খুব অনুশোচনা হয়, কষ্টে দমবন্ধ হয়ে আসে, কেননা বাবা-মা বেঁচে থাকতে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারিনি। মাঝেমাঝে ভাবি আমাকে নিয়ে ওদের শহরে আসার সিদ্ধান্তটা যে কতটা সঠিক ছিল সেটা যদি ওদের জানাতে পারতাম। এসব কথাগুলো ওদের না জানাতে পারার জন্য ভেতরে ভেতরে আমি কুরে কুরে মরি। এসব কথা ওদের আগে জানালে হয়তো ওদের জীবনটা আরও একটু সুন্দর হতো।

*chitrochor.blogspot.com*



সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মুখোশধারীরা। (নিউইয়র্ক গেজেট, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৮)  
শিল্পীর কল্পনায় ‘মুখোশধারী নজরদার’।

শহর আর নিজের জগতের তফাত বুঝিয়ে ঠাকুরদার আমাকে দেওয়া সঠিক ও ভালমানুষ হওয়ার জ্ঞানগুলো যখন আমি আর নিতে পারতাম না, আমি তখন আমার আরেক ভালবাসার জিনিসে মুক্তির আশ্বাদ খুঁজতাম। সস্তা রদ্দি দুঃসাহসিক কল্পকাহিনীগুলোতে। সিনিয়র হলিস ম্যাসন কিন্তু এসব খুনোখুনি-হানাহানিতে ভর্তি চটুল পত্রিকাগুলোকে প্রচণ্ড ঘৃণা অবজ্ঞার চোখেই দেখত। তবে ওগুলোর মধ্যে নৈতিকতার এমন এক ছাপ দেখা যেত যাতে ঠাকুরদার হয়তো সেগুলো চোখে পড়লে কিছুটা হলেও নিজের ধারণা বদলে যেত। ডক স্যাভেজ আর দ্য শ্যাডো হয়তো সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। যেখানে ভাল লোকের কর্মকাণ্ডে কোনওরকমেরই সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না, এবং দুষ্টির অবধারিত ভাবে শেষে গিয়ে কোনও না কোনও শাস্তি হয়। এসব পত্রিকায় ভাল ও সুবিচারের মেলবন্ধন ঘটানো চওড়া

ধারের টুপি পরা আর গর্জে ওঠা বন্দুক হাতে ল্যামেন্ট ট্রান্সটন ও থিটথিটে স্বল্পভাষী মন্টানার খামারবাড়ির বৃদ্ধটাকে একসাথে মেলানোর চেষ্টা করি, ভাবি এই দু’জনের কখনও দেখা হলে এরা কী নিয়ে কথা বলবে। এসব পত্রিকায় যেসব বুদ্ধিমান তৎপর গোয়েন্দা ও মহানায়কেরা আমাদের যেসব দুনিয়ার বলক দেখায়, যেখানে নৈতিকতা জিনিসটা যেভাবে দেখানো হয়, আমার মনে হয় সেটার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। ডক স্যাভেজের দুনিয়ায় ছোট ছোট জাপানি কামাকাজি বিমানের হানা আর শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের সায়ানাইড ক্যাপসুল চিবিয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও প্রাণহানি হয় না। বাছাই করার সুযোগ দিলে আপনি এর মধ্যে কোন দুনিয়ায় থাকতে চাইবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধিৎসাই হয়তো আমাকে পুলিশবাহিনীতে যোগ দেওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই অনুসন্ধিৎসাই পরে আমাকে পুলিশের থেকেও আরও বেশি বড় কিছু হতে সাহায্য করে। এত কিছু লিখছি এই কারণে যাতে আমার বাকি লেখাগুলো আপনাদের বুঝতে সুবিধে হয়। একজনের সাথে আরেকজনের আচার-আচরণ, চিন্তাধারার মিল থাকতেই হবে এমন কোনও মাথার দিব্যি কেউ কাউকে দিয়ে রাখেনি। আমি বাকি সবার কথা বলতে পারব না, আর আমার মনে হয় আমাদের সবারই আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি একেবারে সোজাসাপ্টা বলব— দুঃসাহসিকতা জিনিসটা আমার ভাল লাগে, ভাল কিছু কাজ না করতে পারলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না। আমার মনস্তাত্ত্বিকদের কপচানো বুলি শোনা আছে, আমায় নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, গুজব, বাঁকাকথাগুলোও আমার কানে আসে। কিন্তু আমি পেঁচার মতো পোশাক পরে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করি কেননা অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমার ভাল লাগে, এ-লড়াই চালানোর প্রয়োজন আছে, এবং এ-কাজ করে আমি খুবই আনন্দ পাই।

ঠিক আছে। আর কোনও রহস্য নেই। যা বলার বলে দিয়েছি। আমি উদ্ভট পোশাক পরে ঘুরে বেড়াই। পেঁচার মতো পোশাক। এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়ি। এবার হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন বউপালানো বেচারী মো ভার্ননের রবারের স্তন ও ওয়াগনার শোনার থেকে আমার জীবনের এই বিশেষ দিকটার কথা জেনে একটু হলেও আপনার বেশি হাসি পাবে বলে কেন মনে হয় আমার?

এই ব্যাপারের সূচনা যদি বলেন তাহলে সেটা শুরু হয় ১৯৩৮ সালে। যখন বাজারে প্রথম সুপারহিরো নামক একটি ‘বস্তু’র আমদানি হয়েছিল। ‘অ্যাকশন কমিক্স’-এর প্রথম সংখ্যা যখন বেরোয় তখন আমি অনেকটাই বড় হয়ে গেছি, বা বলা ভাল লোকজনের সামনে কমিক্স পড়ার মতো বয়স তখন আমার নেই। কেননা তা করলে একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতি তৈরি হবে। আমি অনেক বাচ্চাদের এই কমিক্স পড়তে দেখেছি। সেগুলোর ওপর উঁকি মেরে দেখার আর চরিত্রগুলো নিয়ে ফুট কাটার লোভ সামলাতে পারিনি। আসলে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাতে আমার বেশ ভালই লাগে।

অ্যাকশন কমিক্সের ওই প্রথম সংখ্যাটাতে অনেক জমকালো ব্যাপারসাপার ছিল— গোয়েন্দা গল্প, একটা জাদুকরের গল্প যার নামটা এখন মনে নেই, কিন্তু সুপারম্যানের গল্প পড়ার পর আমার চোখ ওতেই আটকে গিয়েছিল। এই প্রথম এই ধরনের পত্রিকায় এমন কিছু একটা ছাপা হয়ে বেরোয় যাতে প্রাথমিক নীতিকথার ব্যাপারটা

আলোআঁধারি আর রহস্যের জট ছাড়া উপস্থাপনা করা হয়েছিল। উজ্জ্বল কাঁচা রঙে রাঙানো সুপারম্যানের রঙিন দুনিয়ায় ছায়ার আশেপাশে ঘনানো ভয়ঙ্কর, অলঙ্কৃণে আবহের কোনও চিহ্ন নেই। মাঝেমধ্যে ছাপানো অবদমিত যৌনতার ইঙ্গিত নেই, যা আমার অস্বস্তি এবং লজ্জার কারণ হতো। মার্গো লেনের সাথে ল্যামেন্ট ট্রান্সটনের ঠিক কী সম্পর্ক ছিল সেটা আমি আজও পরিষ্কার করে বলতে পারব না। কিন্তু ক্লার্ক কেন্ট আর তার বান্ধবী লোয়েসের সম্পর্কের মধ্যে হাজার খুঁজেও কোথাও কোনও আঁশটে গন্ধের ছাপ পাওয়া যাবে না। জানি এসব পুরনো দিনের চরিত্রগুলো এখন কালের চক্রে হারিয়ে গেছে, কিন্তু একটু ভাল করে খুঁজে দেখলে পুরনো দিনের কিছু পাঠকদের পাওয়া যাবে যারা হয়তো বুঝবে আমি কীসের কথা বলছি। একরকম জোর করেই একটা ঘ্যানঘ্যান করা বাচ্চার কাছ থেকে প্রায় কাড়াকাড়ি করে সুপারম্যানের গল্পটা আমি পড়েছিলাম, ফেরত দেওয়ার আগে অবশ্য সেটা আমার বার-আষ্টেক পড়া হয়ে গেছিল।

ব্যাপারটা আমার ভেতর থেকে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া অনেক জিনিসকে খুঁড়ে বের করে এনেছিল। আমার কিশোর বয়সের সমস্ত উদ্ভট কল্পনাগুলোকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল— ক্লাসের সবথেকে সুন্দরী মেয়েকে মস্তানেরা বিরক্ত করছে, আমি সেখানে পৌঁছে সবক'টাকে ধুমধাড়া ক্লাপ পেটালাম, কিন্তু যখন মেয়েটা প্রতিদানে আমায় একটা চুমু খেতে এল, আমি তাকে বাধা দিলাম। গুন্ডারা অঙ্কের টিচার মিস অ্যালবার্টিনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে, আমি সব গুন্ডাগুলোকে মেরে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলাম, গুন্ডাদের কবল থেকে ফিরে এসে মিস অ্যালবার্টিন টিটকিরি মেরে কথা বলা ইংরেজির স্যার মিস্টার রিচার্ডসনের সাথে বিয়ের পাকা কথা ভেঙে দিল, কারণ মিস অ্যালবার্টিন এখন তার চোদো বছর বয়সী কম কথা বলা মুখোশধারী রক্ষাকর্তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ছিনিয়ে নেওয়া কমিক্স বইটা হাঁ করে গিলতে গিলতে এসব পুরনো খামখেয়ালীপনাগুলো বন্যার তোড়ের মতো স্মৃতির অতল থেকে হুড়হুড় করে উঠে আসছিল। কিশোর বয়সের এমন নির্মল খেয়ালের কথা মনে করে মজার চোটে আমি পাগলের মতো একা একাই বেশ কয়েক বার হেসে উঠেছিলাম। এমন প্রাণখোলা হাসি আমি অনেক দিন হাসিনি। মো ভার্ননকে দেখে সেই যে হেসেছিলাম তার ছিটেফোঁটা হাসিও আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত কেউ হাসতে দেখেনি।

আমি মাঝেমধ্যেই সাধাসিধা দেখতে, যাদের সন্দেহের পরিমাণটা একটু কম এমন ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছ থেকে কায়দা করে তাদের হাতেগরম কমিক্সের বইগুলো ধার করতাম। তারপর সারাদিন মাথার মধ্যে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ লাফিয়ে চলা খেলা করতে থাকত। একটা বিশেষ ব্যাপার আমার সাথে না ঘটলে আমার এই উদ্ভট খামখেয়ালী কল্পনাগুলো শুধুমাত্র কল্পনাই থেকে যেত। সে-বছরের শরৎকালে আমি খবরের কাগজ খুলে দেখতে পাই সুপারহিরোরা তাদের চার-রঙা রঙিন দুনিয়া ছেড়ে সাদাকালোর বাস্তব দুনিয়ায় সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে গেছে।

প্রথম খবরটা খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না, সাদামাটাই ছিল। কিন্তু তাতে এমন কিছু ব্যাপার ছিল যেগুলো আমার নজর কাড়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য সেগুলোকে আমার স্মৃতির পাতায় লিখে রাখি। খবরটা নিউইয়র্কের কুইন্স শহরে একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিল। একটি যুবক এবং তার প্রেমিকা এক রাতে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফেরার সময় তিনটে গুন্ডার কবলে পড়ে। ছিনতাই করার পর গুন্ডার দল ছেলেটাকে মারতে শুরু করে, মেয়েটির সাথেও নোংরামি করার হুমকি দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে “গলিটায় উপর থেকে লাফিয়ে পড়া মুখ ঢাকা” এক ছায়ামূর্তির আগমনে সে-কাজে বাধা পড়ে। তিন গুন্ডাকে সে-ছায়ামূর্তি এমন নির্দয় ভাবে উত্তমমধ্যম দেয় যে তিনজনকেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, যাদের মধ্যে একজনের শিরদাঁড়ায় চোট লাগার ফলে দু'টো পা-ই অকেজো হয়ে যায়। এই ঘটনার একেকজন সাক্ষী একেকরকম কথা বলে, যার মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতিরই ছড়াছড়ি বেশি। খবরটায় কী এমন ব্যাপার ছিল বলতে পারব না, কিন্তু পড়তে পড়তে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল এটুকু বলতে পারি। সপ্তাহখানেক পরে আবার আমার সাথে এই একই ব্যাপার ঘটে।

এবারের খবরটায় আরও একটু বেশি বিশদ তথ্য ছিল। এক সুপারমার্কেটে “লম্বা, পালোয়ানের মতো চেহারার, যার পরনে মাথাঢাকা কালো রঙের আঁটসাঁট পোশাক, গলার কাছটায় আবার একটা দড়ির ফাঁস লাগানো” মূর্তির আগমনে একটি ডাকাতি আটকে যায়। ডাকাতি চলার সময় এই অদ্ভুতুড়ে মূর্তিটি জানলা ভেঙে সেখানে এসে পড়ে, তারপর ডাকাতদের যেরকম নির্মম ভাবে বর্বরের মতো মারতে শুরু করে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাতদল অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে। পরপর একইরকম দু'টো ঘটনা ঘটাতে আগের ঘটনাটার সাথে এই ঘটনাটাকে জুড়ে খবরের কাগজে এই খবরটা “মুখোশধারী বিচারক” নাম দিয়ে ছাপা হতে শুরু করল। কমিক্স বইয়ের বাইরে এই প্রথমবার মুখোশ পরা কোনও দুঃসাহসীর নাম দেওয়া হল।

খবরগুলো বারবার পড়তে পড়তে আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পারলাম— এবার আমার পালা। আমি আমার উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি।

*[chitrochor.blogspot.com](http://chitrochor.blogspot.com)*

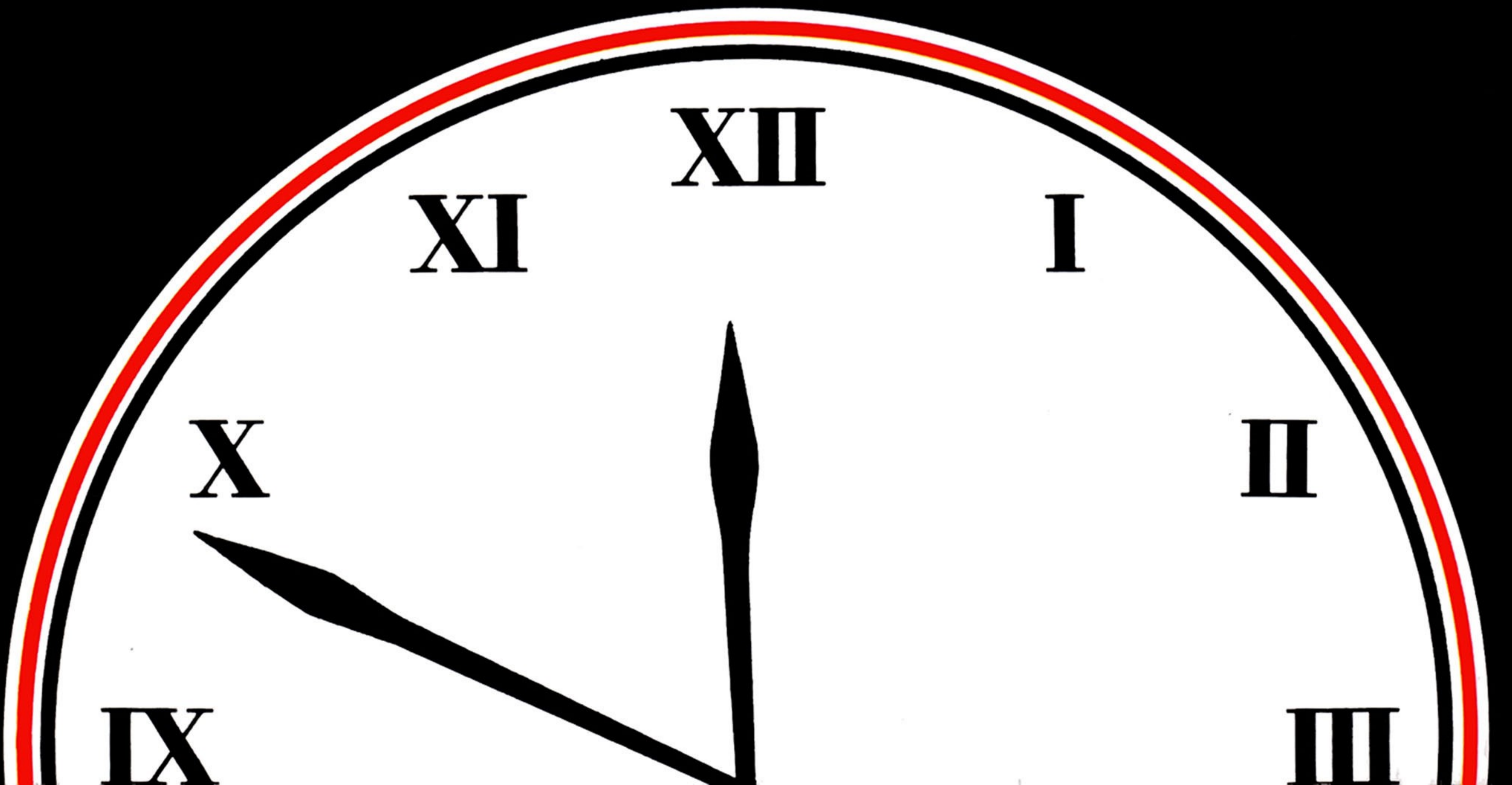
*[chitrochor.blogspot.com](http://chitrochor.blogspot.com)*

# ଏତଂ କମିକ୍ସ ୩ ଛିଅଚୋର କମିକ୍ସେତ୍ ଯୌଥ ପଢ଼ିଦେଶନା ।



eBongComics.blogspot.com

chitrochor.blogspot.com



“শোভার”



জন্য...